ওহীর দর্পনে

সমতল পৃথিবী

সংকলনে - ওয়াসিম সেখ

ওহীর দর্পনে সমতল পৃথিবী

সংকলনেঃ ওয়াসিম সেখ (মুর্শিদাবাদ, ভারত)

প্রথম প্রকাশঃ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরী/ জুলাই, ২০২৪ ঈসায়ী

সোর্সঃ এই সংকলনটি সমাপ্ত করতে অনেক ভাইয়ের থেকে সরাসরি ও তাদের লেখনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রচার সংক্রান্ত নির্দেশিকাঃ এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সকলের জন্য উন্মুক্ত। তাই অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে এটিকে অনলাইনে বা অফলাইনে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। অনুমতি ব্যতীত এই পিডিএফ এর মধ্যে কোনরকমের পরিবর্তন আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে কেউ চাইলে অবিকৃতভাবে এটির ফটোকপি বের করলে দোষনীয় হবে না।

Wasimsaikh03

Blog:

https://wasimsaikh03.blogspot.com/

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560006540134&mibextid=ZbWKwL

সূচিপত্র

১. ভূমিকা

বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের সরদার ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ- এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গের ওপর এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠ অনুসারীদের ওপর।

বর্তমানে পৃথিবী গোলাকার না সমতল এই বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের মুসলিম তলিবুল ইলমদের ভেতর মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। আহলুস সুন্নাহর আলিমদের ভেতরেও এই মতানৈক্য দেখা গেছে। এটা শুধু আজকের মতভেদ নয়, অনেক আগ থেকেই চলমান।

তাই এই মতভেদপূর্ণ বিষয়টিতে আমাদের সেটাই করণীয়, যেটা আল্লাহ ﷻ আমাদের বলেছেন:

فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِکَ خَیۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِیۡلًا

❝অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।❞ [৪:৫৯]

অন্যত্রে রাসূল ﷺ বলেন:

আমি এবং আমার সাহাবী-সঙ্গীরা বর্তমানে যে মত ও পথের উপর আছি সেই মত ও পথের উপর যারা থাকবে তারাই সুপথপ্রাপ্ত।

[তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮; মাকদিসী, আল-আহাদীস আল- মুখতারাহ ৭/২৭৮; আলবানী সহীহু সুনানিত তিরমিযী ৬/১৪১ নং ২৬৪১]

অন্যত্রে আব্দুল্লাহ বিন উমার রাঃ বলেন:

যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন মৃতদেরকে নিজের আদর্শ বানায়। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা। তাঁরা এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। হৃদয়ে সবচেয়ে সৎশীল, ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও ’তাকালস্লুফ’ (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দ্বীন বহনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের চরিত্র

ও নিয়ম-নীতিতে সাদৃশ্য অবলম্বন কর। যেহেতু তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহচর। তাঁরা ছিলেন সরল সুপথের উপর।

[হিলয়াতুল আউলিয়া ১/৩০৫-৩০৬]

তাই একজন মুসলিমের জন্য এটা কখনোই উচিত নয় যে সে কুরআন সুন্নাহর দলীল এবং সাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) মতের দিকে না ফিরে কথিত মহাকাশবিজ্ঞানীদের দেওয়া কুযুক্তির ওপর নির্ভর করে গোলাকার নাকি সমতল তা নির্ধারণ করবে।

যার জন্য আমি এই বইতে কুরআন হাদীসের দলীলের পাশাপাশি সালাফদের থেকে একাধিক বর্ণনা নিয়ে এসেছি, তবে প্রত্যেকটির সনদ সহীহ এমন দাবি আমি করিনা। পাশাপাশি মাঝেমধ্যে বর্তমান সময়ে বিচিত্র অপব্যাখ্যার চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। যাতে পাঠক বুঝতে পারেন সাহাবায়ে কেরাম যে বিশ্বাসের ওপর ছিলেন তার সাথে আজকের কল্পিত সৃষ্টিতত্ত্বের কোনো মিল নেই। তার সাথে বাস্তবতার আলোকেও চাক্ষুষ কিছু দলীল পেশ করেছি, যাতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন বাস্তব জগতেও সেটাকেই সত্যরূপে দেখা যায়, যা পবিত্র কুরআনে ও সাহাবীদের (রাঃ) বর্ণনাগুলোয় পাওয়া যায়। মূলত অভিশপ্ত শয়তান তাঁর অনুসারীদের দিয়েই মহান আল্লাহর পবিত্র সৃষ্টির বিকৃত কনসেপ্টকে মানুষের মাঝে ছড়িয়েছে। তাদের মিশন এমন এক নাস্তিক্যবাদী কসমোলোজিক্যাল কনসেপ্ট ক্রিয়েট করা যেখানে না থাকবে স্রষ্টার অস্তিত্ব আর না থাকবে স্রষ্টার বলা সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে কোনো সম্পর্ক। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেনস্ট্রিম কসমোলজি।

আমি এই বইটিতে সাধ্যমত শারঈ দলীলগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে পরপর সাজানোর চেষ্টা করেছি। যেটা একজন তলিবুল ইলমকে সহজেই সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে সাহায্য করবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে তিনি আমাকে অতি অল্প সময়ে বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য নিয়ে সংকলনটি সমাপ্ত করতে সাহায্য করেছেন। লিখতে গিয়ে কোনো জায়গায় কিছু ভুলত্রুটি হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

* বই পড়ার আগে দুটি বিষয় জেনে রাখুন:

১) এই বইতে দেওয়া ব্যাখ্যায় যে কোনো আয়াতের সঠিক তাফসীর, এমন দাবি আমি করিনা। সালাফদের মাঝেও একটা আয়াতের ব্যাখ্যার ভিন্নতা আমরা দেখতে পাই।

২) আমরা বইতে পৃথিবীকে সমতল বলেই জানবো। কিন্তু এই সমতল আর ঘরের মেঝের সমতল দুটো এক না কিন্তু। অনেকে এই জিনিসটা বুঝতে পারেনা। ঘরের মেঝের সমতল হলো একেবারে মসৃণ, তাতে কোনো রকমের উঁচুনিচু নেই। কিন্ত আমাদের সমতল পৃথিবী অনেক রকম সাগর,পাহাড়,মালভূমি,সমভূমিসহ যা কিছু এর ওপর আছে সবকিছু নিয়ে সমতলে বিছানো, বিস্তৃত। আমরা শুধুমাত্র বর্তমানে কাফির ও অভিশপ্ত শয়তানের অনুসারীদের তৈরি স্ফেরিক্যাল (গোলাকার) পৃথিবীর সাথে চরম পার্থক্য দাঁড় করাতে সমতলে বিস্তৃত, শয্যাক্ষেত্র না বলে সরাসরি 'সমতল পৃথিবী' বলে থাকি।

২. গোলাকার মতবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

গোলাকার মতবাদের ক্রমবিকাশ বুঝার জন্য আমি এখানে ছয়টি পয়েন্ট নিয়ে এসেছি। এই অধ্যায়টি বুঝে না আসলে এড়িয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পড়তে শুরু করুন।

১) গ্রীক জ্যোতির্বিদ:- (ঈসায়ীপূর্ব ২০০০)

গোলাকার মতবাদের প্রচার প্রসার ঘটে ২০০০ ঈসায়ীপূর্বের গ্রীক দার্শনিক,জ্যোতির্বিদদের দ্বারা। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল পিথাগোরাস, সক্রেটিস,প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এরাটোস্থেনিস প্রমুখ।

তারাই অনেকরকমের কুযুক্তি দিয়ে দাবি করে যে পৃথিবী গোল। তাদের মধ্যে কেউ আবার পৃথিবীর কল্পিত ব্যাস পর্যন্ত বের করেছিল। এই দার্শনিক, জ্যোতিষীদের বিস্তারিত বর্ননা দেওয়া জরুরি মনে করিনা। এদের কেউ ছিল পুনর্জন্ম আকীদা প্রচারকারী,কেউ যাদুকর-জ্যোতিষী, কেউ সর্বেশ্বরবাদ আকীদায় বিশ্বাসী, নানা শিরককুফরী ভরা কর্মকান্ডের সাথে জড়িত।

২) ঈসা আঃ এর আগমন:- (২০০০ ঈসায়ী)

অতপর আগমন ঘটে মারইয়াম আঃ এর পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামের। তাঁর ওপর নাযিলকৃত ইনজিল কিতাবেও সমতল পৃথিবীর বর্ণনা ছিল।

৩) জ্যোতির্বিদ টলেমী:- (১৭০ ঈসায়ী)

ঈসা আঃ কে উঠিয়ে নেয়ার পরের সময়টায় বেশ পরিচিতি লাভ করে এ জ্যোতির্বিদ। জ্যোতির্বিদ শাস্ত্রের "*Almagest*" নামক গ্রন্থটি টলেমিরই রচিত। সে দাবী করে, “পৃথিবী গোলাকার ও স্থির। এটি শূন্যের উপর অবস্থিত, এর চারপাশে আছে ঘূর্ণায়মান বিভিন্ন কক্ষপথ।”

পরবর্তীতে দার্শনিকদের কাছে তার লিখিত "*Almagest*" বইটি জ্যোতির্বিদ্যার মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তার প্রসিদ্ধ মতবাদ হলো:

* পৃথিবী গোলাকার ও স্থির

* জ্যোতিষ্করাজি পৃথিবীর চারপাশে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান

৪) রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমন:- (৫৭০ ঈসায়ী)

অবশেষে ৫৭০ ঈসায়ীতে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমন হয়। নাযিল হয় সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আল কুরআন। বহু আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ ﷻ জানিয়ে দেন, পৃথিবী সমতল ও স্থির। সৃষ্টি জগতের বাস্তব চিত্র সাহাবিগণের (রাযি.) কাছে একেবারেই স্পষ্ট ছিলো। বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থে তাদের সূত্রে বর্ণিত 'পৃথিবী সমতল ও স্থির' সম্পর্কিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। (যেগুলো সামনে আসছে)

৫) মুসলিম বিশ্বে গ্রীক দর্শনের প্রবেশ:- (৮ম শতাব্দী)

ইসলামিক সভ্যতার জাগরণের শুরুর কিছু পরেই পিথাগোরিয়ান গ্রীক জ্ঞান ভান্ডার আরবে পৌঁছায়। আব্বাসী খলিফা আবু জাফর আল-মানসূর দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদদের রাজদরবারে টেনে আনে।

ইমাম সুয়ূতী (রঃ) "তারিখুল খুলাফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

"মুহাম্মদ বিন আলী আল-খুরাসানী বলেন, মানসূরই সর্বপ্রথম খলিফা, যে জ্যোতির্বিদদের রাজদরবারে স্থান দেয় এবং রাশিচক্র চর্চা করে। তার নির্দেশেই সর্বপ্রথম অনারবী ভাষার গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়। কালিলা ওয়াদামনা, ইক্লিদিস ইত্যাদি গ্রন্থ এর উদাহরণ। সে-ই সর্বপ্রথম আরবদের উপর প্রাধান্য দিয়ে তার (অনারব) বন্ধুদেরকে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করে। এভাবে চলতে চলতে একসময় আরবরা নেতৃত্বশূণ্য হয়ে যায়..."

[তারিখুল খুলাফা-ইমাম সুয়ূতী]

পরবর্তীতে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে খলিফা মামুন। এই মামুনই 'আল-কুরআন আল্লাহর মাখলুক' মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে চরম ফেতনার সৃষ্টি করেছিলো। দর্শন শাস্ত্রের কিতাবাদির প্রতি তার ছিলো প্রচন্ড আগ্রহ। সে ব্যাপক হারে সেগুলো অনুবাদ করে মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। প্রথমদিকের গুলো খুব সাড়া না জাগালেও ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে চলে আসে জ্যোতিষী টলেমীর '*Almagest*' কিতাবটি। অনুবাদ হবার পরেই আরব এস্ট্রোনমিক্যাল প্রাক্টিসে বিপ্লব ঘটে। গ্রীক দর্শন আরবে প্রবেশের পূর্বে 'পৃথিবীর আকৃতি কিরূপ' সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন

ওঠেনি। যেহেতু পিথাগোরাসের থেকেই স্ফেরিক্যাল আর্থ মডেলের ধারনা গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রবেশ করে, এটা আরবে আবির্ভাবের পরে স্ফেরিক্যাল আর্থ মডেলের ধারনা আরবে চলে আসে। এভাবে যখন সেইসব গ্রীক নিওপ্লেটনিক, পিথাগোরিয়ান, ব্যবিলনিয়ান-হার্মেটিক কিতাবাদি অনুবাদ হয়ে গেল, আরব ভূখণ্ডে নতুন ফিতনার জন্ম নিলো। তারা ইসলামী সভ্যতায় দর্শনশাস্ত্রের অনুপ্রবেশ করিয়ে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করে ও মুসলিম বিশ্বে এক ভয়ংকর বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এরা আলকেমি, জ্যোতিষশাস্ত্র, নিউমেরোলজিসহ সমস্ত নিষিদ্ধ বিদ্যাগুলো চর্চা শুরু করে দিল। পিথাগোরাস/প্লেটোদের Unity of existence (*monism*) বা ওয়াহদাতুল উজুদ, হুলুল এবং ইত্তেহাদের আকিদা কেউ কেউ গ্রহন করলো। যাদুকরদের যেসমস্ত কুফরি আকিদাগুলো ইসলাম পূর্ব মুশরিকদের মধ্যেও ছিল না, সেগুলোকে ধারন করা শুরু করলো। জন্ম হলো বাতেনিয়্যাহ ফের্কার। সুফিজমের নামে যাদুশাস্ত্র থেকে আসা আকিদাগত কুফর ও শিরকের বীজ ইবনে আরাবিদের সহযোগীতায় সর্বত্র ছড়াতে লাগলো। আল কিন্দিকে বলা হতো আরবে দর্শনের জনক। তিনি গ্রীক পিথাগোরিয়ান কুফরি আকিদা এবং ন্যাচারাল ফিলসফিকে ইসলামাইজ করবার জন্য বিশাল ভূমিকা পালন করেন। দর্শন দ্বারা প্রভাবিত যুক্তিবাদীরা বানালো মু'তাযিলা আশ'আরি আরো নানান ফির্কা। জাবের ইবনে হাইয়ান,আল কিন্দি,আর রাযি,আল ফারাবি,ইবনে সিনা প্রমুখ এপথে হাঁটেন। কেউ কেউ হয়তো জীবনের শেষদিকে ফিরে এসেছিলেন। আল্লাহু আ'লাম।

পিথাগোরিয়ান-টলেমিয়ান জ্যোতিষশাস্ত্রের অকল্যানে আরবের সাধারন মানুষের চিন্তায় পরিবর্তন এবং প্রভাব আসা শুরু হয়। তখনকার গণিতজ্ঞ, বিদ্বান আলকেমিস্ট-জ্যোতিষী যাদুকরগন পৃথিবীর ও যমীনের ব্যপারে পিথাগোরিয়ান তত্ত্ব প্রচার করা শুরু করলে সাধারণ মানুষ প্রথম দিকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। অনেক 'আলিমরাও সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আসমান যমীনের প্রকৃতির ব্যাপারে তৎকালীন বিজ্ঞান বা ইলমুল কালামের দ্বারা প্রভাবিত হন। এর মাঝেও কিছু 'আলেম সুস্পষ্টভাবে প্রিমিটিভ জিওস্টেশনারী কস্মোলজির কথা বলেছেন। তাদের অধিকাংশই বড়ো মাপের মুফাসসীরিন! যাদের বক্তব্য একটু পরেই দেখতে পাবেন।

৬) রেনেসাঁর পরবর্তী সময়:-

এরপর যতটুকু বোঝা যায় তার সারমর্ম হলো - রেনেসাঁ পিরিয়ডে আরব থেকে গ্রেসিয়-ব্যবিলনিয়ান আলকেমিক্যাল-কাব্বালিস্টিক কিতাবাদী পাশ্চাত্যে পৌছালে যাদুশাস্ত্রের এর নবজাগরণ ঘটে। এসবের উত্তরসূরি

হয়ে কাজ করে বিভিন্ন সিক্রেট সোসাইটি, রয়েল ফ্যমিলি আর সাথে সেইসব বিজ্ঞানী নামক মিস্টিসিজিমের (Mysticism) অনুসারীরা। যাদের নাম আজ বিজ্ঞানের বইয়ের পাতায় পাতায় দেখা যায়।

এভাবেই আস্তে আস্তে বিভিন্ন কিতাবাদি,মিডিয়া,পত্রিকাতে প্রচারণার মাধ্যমে মানুষের অজান্তেই তাদের মাথায় এই বিলিভ গেঁথে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে কল্পিত অসীম মহাশূন্য ও সৌরজগতের স্বপ্ন দেখিয়ে খুব দ্রুতই সমতল বিশ্বব্যবস্থার কস্মোলজিকে বিদায় জানানো হয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে এই মিথ্যাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় NASA নামে এক শয়তানি সংস্থা। এদের কাজগুলোও গণকদের মতো, একটা সত্যের সাথে বিভিন্নরকম মিথ্যা কথা মিশিয়ে পেশ করা। আর প্রত্যেক দেশের স্পেস এজেন্সিগুলো সকলেই রয়েছে কল্পিত হেলিওসেন্ট্রিজমের পক্ষে যা প্রমাণ করে তাদের মধ্যে ভেতর ভেতর গাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষকে স্পেস ফ্যান্টাসিতে ভোগানো থেকে শুরু করে চাঁদে যাওয়াসহ আরো অনেক রকমের মিথ্যাকাহিনী-বিশ্বাস মানুষের সামনে সুসজ্জিত করে ফুটিয়ে তুলে নরমালাইজেসন করায় তাদের কাজ। এইভাবেই আজকে কল্পিত একটা মতবাদ আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পেয়ে বসে আছে।

আল্লাহ ﷻ সর্বোত্তম জানেন।

৩. পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা

আল্লাহ ﷻ মোট ছয়দিনে আসমান জমিন সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ

❝তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন।❞ [৫৭:৪]

এছাড়াও নীচে উল্লেখিত আয়াতগুলোতেও এই বিষয়ে বর্ণনা এসেছে।

[৫০:৩৮,৩২:৪,১১:০৭,১০:০৩]

এরপর দুটোর মধ্যে কোনটির আগে সৃষ্টি সে সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন:

هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ لَکُمۡ مَّا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا ثُمَّ اسۡتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىہُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ ہُوَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

❝তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেছেন; আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।❞ [২:২৯]

তাফসীরে জাকারিয়া:

এখানে জমিন সৃষ্টির পর আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যমীনকে আসমানের আগেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার মধ্যে খাবার জাতীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেটাকে আসমান সৃষ্টির পূর্বে প্রসারিত ও সামঞ্জস্যবিধান করেননি। তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোযোগী হয়ে সেটাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করেন। তারপর তিনি যমীনকে সুন্দরভাবে প্রসারিত ও বিস্তৃত করেছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

উল্লেখ্য যে, ❝এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন❞ [সুরা নাযি'আত আয়াত ৩০]- এর অর্থ এ নয় যে, আকাশ সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কারণ আমরা দেখলাম প্রথমে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে এরপর আসমানকে। এটি আসলে কোন বিপরীতধর্মী বক্তব্য নয়।

কেননা, পৃথিবী সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বে হলেও পৃথিবী বিস্তৃতকরণ, পানি ও তৃণ বের করা, পাহাড় স্থাপন ইত্যাদি করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পর। *[তাফসীরে জাকারিয়া]*

তাফসীরে আহসানুল বায়ান:

خلق (সৃষ্টি করা) এক জিনিস এবং دحى (সমতল, বিস্তৃত ও বাসোপযোগী করা) করা অন্য এক জিনিস। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আকাশের পূর্বে। কিন্তু তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পর। এখানে সেই তত্ত্বই বর্ণিত হয়েছে। সমতল ও বিস্তৃত করার মানে হল, পৃথিবীকে সৃষ্টির বাসোপযোগী করার জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি গুরুত্ব দিলেন। যেমন, যমীন থেকে পানি নির্গত করলেন অতঃপর তা হতে নানা খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন করলেন। পাহাড়সমূহকে পেরেকস্বরূপ মজবুতভাবে যমীনে গেড়ে দিলেন যাতে যমীনটা না হিলে।

অর্থাৎ, পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয় আকাশ সৃষ্টির আগেই। যেটা প্রচলিত কল্পবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এরপর ৪১ নম্বর সুরায় মোট ছয় দিনের মধ্যে কোনটি কয়দিনে সেটাও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلۡ اَئِنَّکُمۡ لَتَکۡفُرُوۡنَ بِالَّذِیۡ خَلَقَ الۡاَرۡضَ فِیۡ یَوۡمَیۡنِ

❝তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফরী করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন দু’ দিনে।❞ [৪১:৯]

وَ جَعَلَ فِیۡهَا رَوَاسِیَ مِنۡ فَوۡقِهَا وَ بٰرَكَ فِیۡهَا وَ قَدَّرَ فِیۡهَاۤ اَقۡوَاتَهَا فِیۡۤ اَرۡبَعَۃِ اَیَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِیۡنَ

❝আর তার উপরিভাগে তিনি দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দিয়েছেন, আর তাতে চারদিনে প্রার্থীদের জন্য সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন।❞ [৪১:১০]

ثُمَّ اسۡتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلۡاَرۡضِ ائۡتِیَا طَوۡعًا اَوۡ کَرۡهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَیۡنَا طَآئِعِیۡنَ

❝তারপর তিনি আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি ওটাকে (আসমান) ও যমীনকে বললেন, তোমরা উভয়ে

আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে। ❞ [৪১:১১]

فَقَضٰهُنَّ سَبۡعَ سَمٰوَاتٍ فِیۡ یَوۡمَیۡنِ وَ اَوۡحٰی فِیۡ کُلِّ سَمَآءٍ اَمۡرَهَا ؕ وَ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡیَا بِمَصَابِیۡحَ ٭ۖ وَ حِفۡظًا ؕ ذٰلِكَ تَقۡدِیۡرُ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ

❝ অত:পর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু’ দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা। ❞ [৪১:১২]

তাফসীরে জাকারিয়া:

এতে তাফসীরবিদগণ একমত যে, দশম আয়াতে উল্লেখিত চারদিন নবম আয়াতের দুদিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা পবিত্র কুরআনের বর্ণনার বিপরীত। আর জমিন সৃষ্টির চারদিন পরপর ছিলনা বরং দু ভাগে বিভক্ত ছিল। দুদিন আসমান সৃষ্টির আগে এবং দুদিন তার পরে। দশম আয়াতে আসমান সৃষ্টির পরের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

অর্থাৎ প্রথম দুদিন জমিন সৃষ্টি, পরের দুদিন আসমান সৃষ্টি এবং পরের দুদিন জমিনের বাকি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা যোগ করলে মোট ছয় দিন দাঁড়ায়।

<u>একটা সংশয় নিরসন:-</u>

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ্ মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবার, আর তাতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন রবিবার, গাছ-গাছালি সোমবার, অপছন্দনীয় সবকিছু মঙ্গলবার, আলো সৃষ্টি করেছেন বুধবার, আর যমীনে জীব- জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবার। আর আদমকে শুক্রবার আছরের পরে সর্বশেষ সৃষ্টি হিসেবে দিনের সর্বশেষ প্রহরে আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ে সৃষ্টি করেছেন।” *[মুসলিম: ২৭৮৯]*

এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, এই

সৃষ্টিকাজ ছয় দিনে হয়েছে। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে অগ্রাহ্য বলে মনে করেছেন। আবার কেউ কেউ বর্ণনাটিকে কা'ব আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। [ইবনে কাসীর। কিন্তু যেহেতু হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তাই এটাকে অগ্রাহ্য করার কোন সুযোগ নেই। 'আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল-আলবানী রঃ বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন সমস্যা নেই। আর এ বর্ণনাটি কোনভাবেই কুরআনের বিরোধিতা করে না। যেমনটি কেউ কেউ মনে করে থাকে। কেননা, হাদীসটি শুধুমাত্র যমীন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা করে। আর তা ছিল সাতদিনে। আর কুরআনে এসেছে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছিল ছয় দিনে। আর যমীন সৃষ্টি হয়েছিল দুই দিনে। আসমান ও যমীন সৃষ্টির ছয়দিন এবং এ হাদীসে বর্ণিত সাতদিন ভিন্ন ভিন্ন সময় হতে পারে। আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি হওয়ার পর যমীনকে আবার বসবাসের উপযোগী করার জন্য সাতদিন লেগেছিল। সুতরাং আয়াত ও সহীহ হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

[তাফসীরে জাকারিয়া ৪১:১০ আয়াতের ব্যাখ্যায়]

অতএব, এটা দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে আসমান জমিনের সৃষ্টির সাথে কথিত বিগব্যাং থিওরির কোনো মিল নেই, বরং কল্পবিজ্ঞানের এই থিওরি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী একটা কুফরী থিওরি। যারা পবিত্র কুরআন দিয়ে বিগব্যাং থিওরি সত্যায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা আসলে জানতে কিংবা অজান্তে রহমানের বাণীর মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ ﷻ আমাদের ক্ষমা করুন। ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার হবে যদি আমরা সুরা আম্বিয়ার সেই আয়াতের দিকে দেখি যে আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে কল্পবিজ্ঞানীদের বিগব্যাং নামক থিওরি সত্যায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

اَوَ لَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ

❝ যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম

এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবেনা?❞ [২১:৩০]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হিজরী):

হযরত মুজাহিদ রাঃ তাফসীরে রয়েছে যে, এগুলি মিলিতভাবে ছিল। অর্থাৎ পূর্বে সাত আসমান এক সাথেই ছিল এবং অনুরূপভাবে সাত যমীনও একটাই ছিল। তারপর পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়। হযরত সাঈদের রঃ তাফসীরে আছে যে, এ দু'টো পূর্বে একটাই ছিল, পরে পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রাখা হয়েছে। পানিকে সমস্ত প্রাণীর আসল বা মূল করে দেয়া হয়েছে।

তাফসীরে জাকারিয়া:

{رتق} শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া, আর {فتق} এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি {رتق} ও {فتق} কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে হিসেবে আয়াতের অনুবাদ এই দাঁড়ায় যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি ।

সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন এর অর্থ হচ্ছেঃ আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিত ছিল তারপর আমরা সে দুটিকে পৃথকীকরণ করেছি। হাসান ও কাতাদা রাহেমাহুমাল্লাহ বলেনঃ এতদুভয়ের মধ্যে বাতাস দ্বারা পৃথকীকরণ করেছেন। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারলাম যে উপরের মজবুত আসমান ও নিচের এই সমতল জমিন একসময় একসাথে মিশে ছিল, অতপর মহান আল্লাহ দুটোকে আলাদা করে দেন, উপরে আসমান ও নীচে জমিন। অপরদিকে, কল্পিত বিগব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে এক (কল্পিত) মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে (কল্পিত) মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এরপর ধাপে ধাপে (কল্পিত) গ্যালাক্সি,নক্ষত্র,গ্রহগুলোর উৎপত্তি ঘটে। বিগব্যাং-এর প্রায় ৯ বিলিয়ন বছর পর (কল্পিত) সৌরজগত এবং এরপর বাকি গ্রহগুলো সৃষ্টি হয়। তারই মধ্যে একটা (কল্পিত) ছোট্ট গ্রহ হলো পৃথিবী।

সবকিছুই তাদের কল্পনা আর মিথ্যাচার। এইসব আজগুবি মনগড়া কল্পকাহিনীকে আজ বইয়ের পাতায় পাতায় দেখা যায়। চূড়ান্ত সত্য সেটাই যেটা মহান আল্লাহ আমাদের বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

❝আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী করিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও নয়, আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণকারী নই।❞ [১৮:৫১]

শাইখ সালিহ আস সিন্দী হাফিযাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, **বিগব্যাং** কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক?

তখন শাইখ জবাবে বলেন:

❝**জী, এটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক**। আল্লাহ তার আসমান ও যমীন সৃষ্টির ব্যাপারে যা ঘোষণা করেছেন এটা তার বিপরীত। [তাদেরকে জিজ্ঞেস কর হে নবী] 'তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন? আর তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ বানাতে চাচ্ছ? তিনিই সৃষ্টিকুলের রব'।" [৪১:০৯] ।

আর এর পাশাপাশি আল্লাহ এই আয়াতে যা উল্লেখ করেছেন,আল্লাহ আসমান ও জমিন কত দিনে সৃষ্টি করেছেন? ছয় দিনে। এবং [অর্থাৎ যারা বিগ ব্যাং তত্ত্বকে সমর্থন করে] তারা বলে যে একটি ছোট গোলক ছিল, যা কোন স্থানে শূন্যতায় ভাসছিল। এবং ১২ বিলিয়ন বছরেরও বেশি সময় আগে নয়, তারপর এটি একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়, যা এই মহাবিশ্বের সূচনা নির্দেশ করে। এটি কোনো জ্ঞান বা প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত একটি দাবি, তাদের পক্ষ থেকে নিছক অনুমান।❞

দেখুনঃ https://youtu.be/5th2vfLKLvw?feature=shared

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, যে আয়াত [২১:৩০] বিগব্যাং এর ভুয়াতত্ত্ব থেকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার সৃষ্টির পবিত্রতা ঘোষনা করে, সেই আয়াতকেই আজকের মডারেটরা বিগব্যাংকে সত্যায়নের দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। আল্লাহুল মুস্তা'আন। এজন্য যারা কুরআন হাদিসে বর্নিত কস্মোলজির সম্পর্কে জ্ঞানহীন তারা এইসব অপব্যাখ্যাকেই সত্য বলে ভাবতে শুরু করে।

৪. পৃথিবী স্থির

কথিত মহাকাশবিজ্ঞানীরা বলে যে এই পৃথিবী অবিরাম ঘুরছে। শুধু তাই নয় কল্পবিজ্ঞানীরা এর গতিকে আবার তিন ভাগে ভাগও করেছে।

প্রথম প্রকার: নিজ অক্ষকেন্দ্রিক ঘূর্ণনগতি ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল,

দ্বিতীয় প্রকার: সূর্যকেন্দ্রিক ঘূর্ণনগতি ঘণ্টায় প্রায় ৬৭,৭৫৬ মাইল,

তৃতীয় প্রকার: কথিত সৌরজগতসহ (কল্পিত) গ্যালাক্সিকেন্দ্রিক ঘূর্ণনগতি ঘণ্টায় প্রায় ৪৪৭,০০০ মাইল।

[সূত্র:https://www.space.com/33527-how-fast-is-earth-moving.html]

কিন্তু শারঈ দলিল এবং বাস্তবতার আলোকে আমরা যা দেখতে পাই তাহলো পৃথিবী স্থির এবং নিশ্চল।

পৃথিবীর স্থিরতা সম্পর্কে আয়াত:-

আল্লাহ তা'য়ালা একাধিক জায়গায় আকাশ পৃথিবীর নিশ্চিলতা সম্পর্কে জানিয়েছেন।

১) মহান আল্লাহ বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ یُمۡسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ اَنۡ تَزُوۡلَا

❝নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে রাখেন যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়।❞ [৩৫:৪১]

* {یُمۡسِكُ} - স্থিরভাবে ধরে রেখেছেন।

{تَزُوۡلَا} - স্থানচ্যুত হওয়া অর্থাৎ আকাশ-পৃথিবীকে মহান আল্লাহ এমনভাবে রেখেছেন যে সেগুলো স্থানচ্যুত হয়না। স্থানচ্যুত না হওয়া প্রমাণ করে যে আকাশ ও পৃথিবী নিশ্চল।

২) মহান আল্লাহ বলেন:

اَمَّنۡ جَعَلَ الۡاَرۡضَ قَرَارًا

❝বরং তিনি, যিনি যমীনকে আবাসযোগ্য করেছেন..❞ [২৭:৬১]

* {قَرَارًا} - বসোপযোগী/স্থিতিশীল।

অর্থাৎ স্থির ও অটল। না নড়ে-চড়ে, আর না দোল খায়। যদি এ রকম না হত তাহলে পৃথিবীতে বসবাস করা অসম্ভব হত। পৃথিবীতে বিশাল বিশাল পাহাড় সৃষ্টি এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে, যাতে পৃথিবী নড়া-চড়া না করতে পারে। *[তাফসীরে আহসানুল বায়ান]*

৩) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ اَلۡقٰی فِی الۡاَرۡضِ رَوَاسِیَ اَنۡ تَمِیۡدَ بِکُمۡ

❝তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান পর্বতমালা যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া না করে...❞ [৩১:১০]

* {ميد} - নড়াচড়া করা।

পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপর ভারী বোঝা করে রাখা হয়েছে যাতে পৃথিবী স্থির থাকে এবং নড়া-চড়া না করে। এই জন্য পরে বলা হয়েছে,

{ ان تَمِيدَ بِكُم } অর্থাৎ, পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া না করে অথবা এই জন্য যে, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক না দোলে। যেমন সমুদ্র তীরে সামুদ্রিক জাহাজগুলোকে বড় বড় নঙ্গর গেড়ে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে জাহাজ সরে না যায়। পৃথিবীর জন্য পর্বতমালাও অনুরূপ নঙ্গর স্বরূপ। *[তাফসীরে আহসানুল বায়ান]*

৪) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ مِنۡ اٰیٰتِهٖۤ اَنۡ تَقُوۡمَ السَّمَآءُ وَ الۡاَرۡضُ بِاَمۡرِهٖ ؕ

❝আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তাঁরই নির্দেশে আসমান ও যমীন স্থিতিশীল থাকে।❞ [৩০:২৫]

* {تَقُوْمَ} - প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ।

অর্থাৎ আকাশ-পৃথিবী নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে যেমনটা উমার রাঃ বলতেন।

৫) মহান আল্লাহ বলেন:

اَللّٰهُ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ قَرَارًا

❝আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থিতিশীল করেছেন…❞ [৪০:৬৪]

৬) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ اَلۡقٰی فِی الۡاَرۡضِ رَوَاسِیَ اَنۡ تَمِیۡدَ بِکُمۡ

❝আর তিনি যমীনে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন তোমাদের নিয়ে হেলে না যায়..❞ [১৬:১৫]

৭) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ جَعَلۡنَا فِی الۡاَرۡضِ رَوَاسِیَ اَنۡ تَمِیۡدَ بِہِمۡ ۪

❝আর পৃথিবীতে আমি স্থাপন করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া না করে।❞ [২১:৩১]

সুতরাং, পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, মহান আল্লাহ আকাশ ও জমিন তথা পৃথিবীকে স্থির রেখেছেন। উল্লেখিত প্রতিটা শব্দই পৃথিবীর নিশ্চলতার পক্ষেই কথা বলে এবং এটা স্পষ্ট। এরপরেও আকলকে নসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে অনেকেই বিষয়গুলো এড়িয়ে যান।

আসমান জমিনের স্থিরতার পক্ষে তাফসীর:-

১) আল্লাহ ﷻ আসমান জমিনের স্থিতি সম্পর্কে বলেন:

وَ مِنۡ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡ تَقُوۡمَ السَّمَآءُ وَ الۡاَرۡضُ بِاَمۡرِہٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاکُمۡ دَعۡوَۃً ٭ۖ مِّنَ الۡاَرۡضِ ٭ اِذَاۤ اَنۡتُمۡ تَخۡرُجُوۡنَ

❝আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি থাকে; তারপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে উঠার জন্য একবার ডাকবেন তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে।❞ [৩০:২৫]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হিজরী):

তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, যমীন ও আসমান তাঁরই হুকুমে স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি আকাশকে পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়তে দেন না। আসমান যমীনকে ধরে আছেন এবং ওকে ধ্বংস হতে রক্ষা করছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন ব্যাপারে কঠিন শপথ করতে চাইতেন তখন বলতেন,

لا والذي تقوم السماء والارض بأمره

অর্থাৎ, শপথ তাঁর যাঁর নির্দেশে আসমান ও যমীন স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

২) মহান আল্লাহ বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ يُمۡسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ اَنۡ تَزُوۡلَا ۚ وَ لَئِنۡ زَالَتَاۤ اِنۡ اَمۡسَكَهُمَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيۡمًا غَفُوۡرًا

❝নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া কেউ নেই যে, তাদেরকে ধরে রাখতে পারে। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ন।❞ [৩৫:৪১]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হিজরী):

আসমান ও যমীনে তাঁরই হুকুম কায়েম রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে স্থির রয়েছে। এদিক ওদিক চলে যায় না। আকাশকে তিনি যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে মাহফুয রেখেছেন। প্রত্যেকটাই তাঁর হুকুমে নিশ্চল ও স্থির রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউই এগুলোকে স্থির রাখতে পারে না এবং সুশৃংখলভাবে কায়েম রাখতে পারে না।

বস্তুত, পৃথিবীকে গতিশীল দাবিদাররা নিজেদের আকলকে নসের উপরে প্রাধান্য দেয়। নিজেদের ক্ষুদ্র ইলমকে অজান্তেই সাহাবীদের Understanding-কে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। ওরা বলতে চায় এই আয়াত দ্বারা স্থিরতা বা নিশ্চলতা বোঝানো হয়নি। অথচ আলোচ্য আয়াতটিকে [৩৫:৪১] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ ঘূর্নন বা আবর্তনকে খন্ডন করতে ব্যবহার করেছেন। নীচের বর্ণনাটি দেখুন-

ইমাম ইবনে জারীর রঃ বর্ণনা করেছেন যে (এর ইশনাদ বিশুদ্ধ), একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ-এর কাছে আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কোথা হতে আসলে?" সে উত্তর দিলোঃ "সিরিয়া হতে।" তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "সেখানে কার সাথে সাক্ষাৎ করেছো?" সে জবাবে বললোঃ "হযরত কা'ব রাঃ-এর সাথে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "কা'ব রাঃ কি বর্ণনা করলেন?" লোকটি উত্তর দিলো যে, হযরত কা'ব রাঃ বললেনঃ "আসমান একজন ফেরেশতার কাঁধ পর্যন্ত ঘুরতে আছে।" হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ লোকটিকে বললেনঃ "তুমি কি তাঁর কথাটিকে সত্য বলে মেনে নিলে, না মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলে?" লোকটি জবাব দিলোঃ "আমি কিছুই মনে করিনি।" তখন তিনি বললেনঃ "হযরত কা'ব রাঃ ভুল বলেছেন।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন "নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া কেউ নেই যে, তাদেরকে ধরে রাখতে পারে। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ন" *[তাফসীরে ইবনে কাসীর]*

সুতরাং, একজন সাহাবির স্পষ্ট সহীহ বর্ননা দেখলেন যেটা আকাশ ও পৃথিবীর নিশ্চলতার ব্যাপারে পরিষ্কার ধারনা দিয়েছে। ইমাম মালিকও রঃ একথা খণ্ডন করতেন যে, আসমান ঘুরতে রয়েছে। আর তিনি এ আয়াত হতেই দলীল গ্রহণ করতেন। এ আয়াতে আসমানের পাশাপাশি আল্লাহ পৃথিবীকে স্থির রাখার কথাও বলেন। এতে প্রমান হয় আসমান ও যমীন উভয়ই স্থির ও নিশ্চল। এটাই সাহাবীদের (রাঃ) বিশুদ্ধ আকিদা বা বিশ্বাস। হযরত উমার রাঃ যখন কোন কিছুকে বিশ্বাস করানোর জন্য কসম করতেন তখন বলতেন, "সেই মহান সত্ত্বার শপথ দিয়ে বলছি যার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে" *[ইবনে কাসীর]*

৩) আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ اَنْهٰرًا وَّ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

❝আর তিনি যমীনে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন তোমাদের নিয়ে হেলে না যায় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার।❞ [১৬:১৫]

তাফসীরে জাকারিয়া:

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন- যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। তাই এখানে

{أَنْ تَمِيْدَ} এর পূর্বে كَرَاهِيَة বা أن এর পরে لا **শব্দটি** উহ্য ধরে নিয়ে অর্থ করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

তাফসীরে তাবারী (৩১০হিজরী):

আল্লাহ তায়ালা পাহাড়সমূহ দ্বারা পৃথিবীকে স্থির করে দিলেন, যেন এটি এর উপর বসবাসকারীদেরকে নিয়ে হেলেদুলে না যায়। পাহাড় দ্বারা স্থির করার পূর্বে এটি হেলেদুলে যাচ্ছিলো।

* আমাদের কাছে বিশর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইয়াযীদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, কাতাদা থেকে, আল-হাসান থেকে, কায়েস ইবনে আব্বাদের সূত্রে: "আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করার পর এটি হেলেদুলে যাচ্ছিলো। ফেরেশতাগণ তা দেখে বললেন, এই জমিনে কেউ বসবাস করতে পারবে না। পরদিন সকালে তারা দেখতে পেলো এর উপর প্রোথিত করা হয়েছে সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ।"

তাফসীরে বাগাওয়ী (৫১৬হিজরী):

"আর তিনি যমীনে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন তোমাদের নিয়ে হেলে না যায়" অর্থাৎ যাতে তোমাদের নিয়ে না হেলে যায়, এর অর্থ নড়াচড়া করা ও ঢলে যাওয়া।

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হিজরী):

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর উপর সুদৃঢ় উঁচু উঁচু পাহাড় প্রোথিত করলেন, যেন এটি নড়েচড়ে বা হেলেদুলে না যায়। এমনটি না করলে (পৃথিবীর নড়াচড়ার কারণে) মানুষের জীবন দুর্বিষহ হতো।

৪) আল্লাহ ﷻ বলেন:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا

❝আমি কি পৃথিবীকে বিছানা সদৃশ করিনি এবং পর্বতসমূহকে পেরেকের মতো নির্মাণ করিনি?❞ [৭৮: ৬,৭]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হিজরী):

অর্থাৎ, আমি সমস্ত সৃষ্টি জীবের জন্য এই পৃথিবীকে সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছি এভাবে যে, ওটা তোমাদের সামনে বিনীত ও অনুগত রয়েছে। নড়াচড়া না করে নিরবে পড়ে আছে। আর পাহাড়কে আমি এর উপর পেরেক বানিয়েছি, যাতে পৃথিবী হেলেদুলে পড়ে যেতে না পারে এবং এর উপর বসবাসকারীরা যেন উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ে।

পানির উপর হেলেদুলে যাওয়া জাহাজকে যেভাবে নোঙ্গর দ্বারা স্থির করা হয়, তদ্রুপ সমতল পৃথিবীর উপর পাহাড়সমূকে পেরেকের মতো গেঁথে দেওয়া হয়েছে, যেন এটি হেলে না যায়।

৫) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ جَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ

❝এবং আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে যমীন তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমরা সেখানে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে।❞ [২১:৩১]

তাফসীরে শাওকানী (১২৫০হিজরী):

"এবং আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত" এর অর্থ স্থির পর্বতমালা, যাতে তা তাঁদের নিয়ে নড়াচড়া না করে। নড়াচড়া মানে চলা এবং ঘোরা। অর্থাৎ, যাতে তারা নড়াচড়া না করে এবং না ঘোরে।

৬) বায়তুল মামুর প্রমাণ করে পৃথিবী স্থির।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَّ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ

❝শপথ বায়তুল মামুরের।❞ [৫২:৪]

তাফসীরে তাবারী (৩১০হিজরী):

ইবনে জারির তাবারি রঃ বর্ণনা করেন, কাতাদা রঃ হতে বর্ণিত:

নবী ﷺ একদিন তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জানো বাইতুল মামুর কি?' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো

জানেন।' তিনি বললেন, 'এটি আসমানে কাবা বরাবর অবস্থিত একটি মসজিদ। এটি যদি পতিত হয়, তবে কাবার উপরেই পতিত হবে'।

তাফসীরে জাকারিয়া:

আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কাবাকে বায়তুল মামুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত।

এবার লক্ষ্য করুন, বাইতুল মামুরকে কাবার ঠিক উপরে হওয়ার জন্য এবং কাবার উপর পতিত হওয়ার জন্য পৃথিবীকে অবশ্যই স্থির হতে হবে। কল্পিত গোল পৃথিবী যদি চলনশীল হতো তাহলে এমনটা হতো না।

স্থির পৃথিবীর পক্ষে আরো কিছু দলীল:-

১) ইউশা বিন নূন আঃ এর ঘটনা প্রমাণ করে পৃথিবী স্থীর।

আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নবি ﷺ বলেছেন,

"কোনো একজন নবি জিহাদ করেছিলেন। অতঃপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, 'তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন।' তখন তাকে থামিয়ে দেয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন।" *[সহিহ বুখারি: ৩১২৪]*

উল্লেখিত হাদিসে ইউশা বিন নুন (আ.) জুমার দিন আসরের সময় যুদ্ধ করছিলেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি বিজয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। কিন্তু এদিকে মাগরিবের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেলো। আর ইহুদীদের শরীয়তে শনিবার যুদ্ধ হারাম ছিলো। যেহেতু সূর্যাস্তের পর পরই শনিবার শুরু হয়ে যাবে, তাই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ যেন সূর্যের গতি কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দেন। অতপর তিনি বিজয়ী হওয়া পর্যন্ত সূর্য স্থির ছিলো।

লক্ষ্য করুন, পৃথিবী যদি সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান হতো, তবে সূর্যের গতিরোধ করলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে তো ঠিক পূর্বের মতোই মাগরিব চলে আসতো। সুতরাং এই হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়, পৃথিবী স্থির বরং সূর্যই আকাশের কক্ষপথে ঘূর্ণনশীল।

২) স্থির নক্ষত্রগুলো প্রমাণ করে পৃথিবী স্থির।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَ عَلٰمٰتٍ ؕ وَ بِالنَّجۡمِ هُمۡ یَهۡتَدُوۡنَ

❝এবং পথ নির্দেশক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথনির্দেশ পায়।❞ [১৬:১৬]

কম্পাস আবিষ্কারের পূর্বে সমুদ্রের নাবিকরা তারা দেখে দিক নির্ণয় করতো। আপনি পারেন নক্ষত্রের অবস্থান দেখে দিক নির্ণয় করতে? এজন্য আপনাকে ধ্রুবতারা খুঁজে বের করতে হবে। ধ্রুবতারা থাকে উত্তর আকাশে। তাই উত্তর দিকটা খোলা থাকতে হবে আপনার সামনে। কোন পাহাড় বা উঁচু ভবন থাকা যাবে না।

<u>দিক নির্ণয়ের পদ্ধতি:</u>

- ধ্রুব তারার পাশে থাকে দুটো সপ্তর্ষি। সপ্তর্ষি সাতটি তারকা মিলে চতুর্ভুজ গঠন করে।
- সপ্তর্ষি দেখেই আপনাকে ধ্রুব তারা খুঁজে বের করতে হবে।
- ধ্রুব তারাকে সামনে নিয়ে দাঁড়ালে আপনার পিছনের দিকটা দক্ষিণ, ডানে পূর্ব, আর বামে পশ্চিম।

আপনি সারা বছরই এই ধ্রুবতারাকে একই স্থানে দেখতে পাবেন। পৃথিবী স্থির না হলে তারাগুলোকে সেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষ একই স্থানে দেখতে পেতো না।

সুতরাং, শারঈ দলিলগুলো স্পষ্ট আকাশ পৃথিবীর নিশ্চিলতার পক্ষেই কথা বলে। আর এটাই ছিল সালাফদের আকিদা বা বিশ্বাস। যেমনটা

ইমাম কুরতুবি রঃ (৬৭১হি.) বলেছেন: ❝আহলে-কিতাব ও মুসলিমদের বক্তব্য হলো, পৃথিবী স্থির ও নিশ্চল। এটি কেবল ভূমিকম্পের সময় নড়ে ওঠে।❞ *[তাফসীর আল-কুরতুবী ৯/২৪৫]*। আর এটাই বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ মিল খায়।
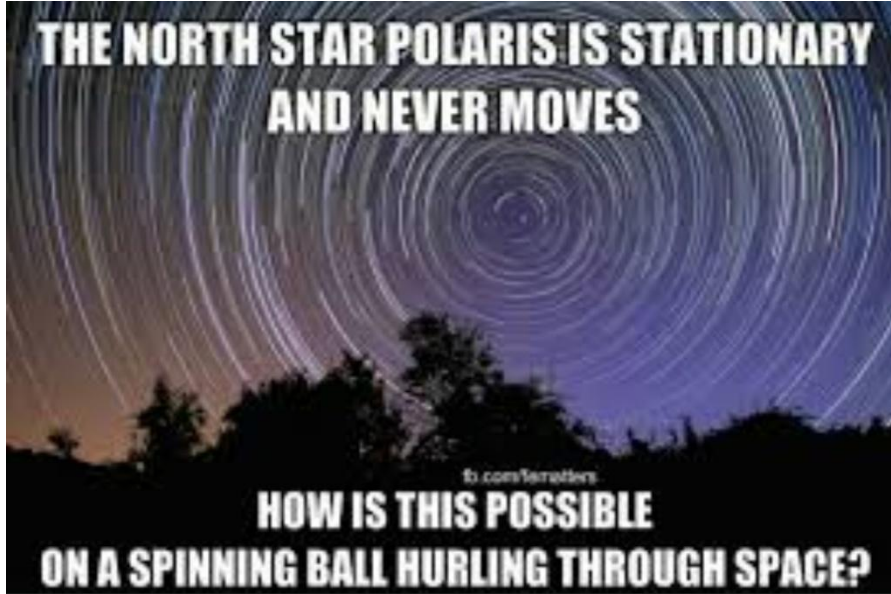
পৃথিবীর স্থিরতার পক্ষে 'আলিমদের ফতোয়া:-

১) যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ শাইখুল ইসলাম ইমাম 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ১৪২০হিজরী/১৯৯৯ঈসায়ী] প্রদত্ত ফতোয়া–

❝পৃথিবীর ঘূর্নন এবং গতিকে অবশ্যই আমি প্রত্যাখান করি এবং আমি এর অবৈধতার প্রমাণ ব্যাখ্যা করেছি, আমি তাদেরকে কাফির বলছি না যারা এর স্বপক্ষে বলে। কিন্তু আমি তাদেরকে কাফির ঘোষনা করছি যারা বলে, সূর্য স্থির ও গতিহীন, কেননা এটা সুস্পষ্টভাবে কুরআনের এবং বিশুদ্ধ হাদিসের বিরুদ্ধে যায়।❞

[মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বাজ ৯/২২৮]

২) শায়খের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত তরজমাঃ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে তিনি পৃথিবীকে একটি বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন, এটিকে পাহাড় দিয়ে নোঙর করেছেন, এটি স্থাপন করেছেন এবং এটিকে তাঁর বান্দাদের জন্য একটি বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন, যেখানে তারা হাঁটে এবং যার উপর তারা ঘুমায় এবং

সেখানে তারা লাঙ্গল চালায় এবং গাছ লাগায়, সমুদ্র, এবং সেখানে রিযিক অন্বেষণ।

যদি একজন দাবিদার বা একজন ফটোগ্রাফার দাবি করেন যে এটি মহাকাশে সাঁতার কাটে, এর জন্য তার সত্যবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই, সে কমিউনিস্ট, খ্রিস্টান, ইহুদি বা মুসলিম যাই হোক না কেন।

আল্লাহর কালাম সকলের চেয়ে সত্য। একজন ব্যক্তির জন্য, তিনি কল্পনা করতেই পারেন যে গতি দ্বারা কিছু ঘূর্ণায়মান বা সাঁতার কাটছে। ব্যাপারটা সে যেমন বলেছে তেমন নয়।

এবং আল্লাহ বলেছেন যে তিনি এটিকে আমাদের জন্য একটি বিশ্রামের স্থান বানিয়েছেন এবং বলেছেন,

‘আর তিনি যমীনে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন তোমাদের নিয়ে হেলে না যায়’

এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ এটা স্পষ্ট করেছেন যে তিনি এটিকে পাহাড়ের সাথে স্থির করেছেন, এটিকে নোঙ্গর করেছেন এবং এর জন্য খুঁটি তৈরি করেছেন, তাই এটি মেনে চলা এবং এটিকে অবলম্বন করা প্রয়োজন, এবং এটি দোল খায় না, এটি আন্দোলিত হয় না বা এটি ঘোরে না, এবং যদি এটি ঘুরত তবে ভূমিকম্পের কারণে বান্দারা যেভাবে এটি অনুভব করে, এবং যেমন যদি ভূমিকম্পগুলো ছোটও হয় তেমনি ঘোরাটা অনুভব করত।

তারা আমাদের কাছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কথা বলে, কিন্তু কুরআন সুন্নাহর দলিল ছাড়া আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না।

পৃথিবী স্থিরের উপর ইমাম বিন বায রহিমাহুল্লাহ একটি কিতাব লিখেছেন এবং সেখানে তিনি আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

দেখুনঃ https://youtu.be/nbzh7p2ZlFQ?feature=shared

৩) সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের প্রবীণ সদস্য, যুগশ্রেষ্ঠ ফাকিহ আশ-শাইখুল 'আল্লামা ইমাম সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ (জন্ম:১৩৫৪ হিজরী/১৯৩৫ ঈসায়ী) প্রদত্ত ফতোয়া–

আমাদের বা মুমিনদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, যেমনভাবে তারা (নক্ষত্র) এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তু (আফলাক) প্রদক্ষিণ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত।

দেখুনঃ https://youtu.be/NH_NQisXTRE?feature=shared

৪) শায়খ অন্যত্রে বলেন–

প্রশ্নকারী: যদি বায়তুল মা'মুর পৃথিবীর বায়তুল হারামের (কাবার) সম্পূর্ণ বিপরীতে থাকে, তবে পৃথিবী যখন নিজের চারপাশে ঘোরে তখনও কি এমন হয়?

শায়খ: পৃথিবীর এই ঘূর্ণন আপনার কাছ থেকে যে কেউ বলেছে যে এটি ঘোরে, এটি কি কুরআনে নাযিল হয়েছে? সহীহ সুন্নাতে কি ঘূর্ণনের হওয়ার কথা উল্লেখ ছিল? এটি ভূগোলবিদরা বলে এবং তারা যা বলে তার উপর নির্ভর করা হয় না। জ্বি।

দেখুনঃ https://youtu.be/ANqHwMRlmPU?feature=shared

৫) শায়খ অন্যত্রে বলেন,

কোনো সন্দেহ নেই কুরআন থেকে এটাই বুঝা যায় যে সূর্য ঘুরে। আরা তারা বলে সূর্য থেমে থাকে আর পৃথিবী ঘুরে অথচ এটা কুরআনের বিপরীত মত। ইবরাহীম আঃ নমরুদ কে বলেছিলেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো। তারপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।" (২:২৫৮)

সুতরাং আমাদের জন্য কুরআন যা নির্দেশ করে তা ত্যাগ করে উদ্ভাবিত তত্ত্ব গ্রহণ করা, এটি একজন মুসলমানের আচরণ নয়। মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব হলো কুরআন কে অনুসরণ করা। আল্লাহ ﷻ বলেন, "আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী করিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও নয়, আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণকারী নই।" (১৮:৫১)

দেখুনঃ https://youtu.be/Ht98Wc6UfvM?feature=shared

৬) বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ফাকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসুলবিদ আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহর [মৃত: ১৪২০হিজরী] বলেন–

<u>প্রশ্নকারী:</u> সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, এটা কি কুরআন অনুযায়ী?

<u>শায়খ:</u> কুরআনে এটাই আছে। পৃথিবী হল সেই কেন্দ্রস্থল যার চারপাশে সূর্য প্রদক্ষিণ করে...এবং এর প্রমাণ হল মহান আল্লাহর বাণী: "আর আপনি দেখতে পেতেন সূর্য উদয়ের সময় তাদের গুহার ডান পাশে হেলে যায় এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে," (১৮:১৭)

তাই এখানে আল্লাহ সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার কাজকে দায়ী করেছেন। তিনি এটিকে ঝুঁকে পড়া এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কাজটিকেও দায়ী করেছেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ বলেন: "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।" (৩৬:৩৮)

অতএব, কুরআন থেকে যা স্পষ্ট যে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে...এবং ফলস্বরূপ এই আপাত প্রমাণ গ্রহণ করা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক...এবং আমরা বলি পৃথিবী হলো কেন্দ্রস্থল.. আর সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে... এবং চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং নক্ষত্রগুলিও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এমনকি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নবী আবু যরকে বলেছিলেন:"তুমি কি জানো কোথায় যাচ্ছে? তিনি (আবু যার) বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।" তাই তিনি (নবী) বললেন: "নিশ্চয়ই এটি আরশের কাছে সিজদা করবে এবং অনুমতি চাইবে (চলতে থাকবে).....এবং যদি এটিকে অনুমতি না দেওয়া হয় তবে এটি যে দিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যাবে। এটা পরিষ্কার।

দেখুনঃ https://youtu.be/4rJI7S6nHiA?feature=shared

৭) এছাড়াও এই বিষয়ে তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন:

"....এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। একথা বলা হয় নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘূরত তাহলে অবশ্যই তা বলা হত।

৩) মহান আল্লাহ বলেন,

“তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।” (সূরা কাহাফ, আয়াত: ১৭)

পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদি নড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে। পৃথিবী নয়।....."

[ফতোয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং-১৬, উত্তরের কিছুটা অংশ দেওয়া হয়েছে]

৮) শায়খ উবায়েদ আল জাবিরি রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ১৪৪৪হিজরী/২০২২ ঈসায়ী] বলেন–

আমি বলি, কুরআন ও সুন্নাহ যা জানায়....তা হলো প্রদক্ষিণ সূর্য দ্বারা সম্পন্ন হয়, সূর্য প্রদক্ষিণ করে...এবং পৃথিবী স্থির। এছাড়াও পৃথিবী স্থির এবং সূর্য যে নড়াচড়া করে তা যে সহীহ হাদিস থেকে দালিলিকভাবে প্রমাণিত তা হলঃ মূসা ও হারুনের আ: উত্তরসূরি ইউশা বিন নুন (আ:)... যে ব্যক্তি তাদের পরে নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন... বায়তুল মাকদিসে পৌঁছালেন,,,আর সূর্য ডুবতে শুরু করেছে... তাই তিনি বললেনঃ "নিশ্চয়ই তোমাকে আদেশ করা হয়েছে এবং আমিও আদেশপ্রাপ্ত। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এটাকে সংযত করুন।” তাই আল্লাহ সূর্যকে (তার জায়গায়) আটকে রাখেন যতক্ষণ না সেই নবী আ: বায়তুল মাকদিসে প্রবেশ করেন এবং আল্লাহ তাকে এর উপর বিজয় দান করেন। অতএব, যদি পৃথিবীটি প্রদক্ষিণ করতো...তাহলে এই নবী আ: সূর্যকে সম্বোধন করা সময়ের অপচয় হয়ে যেত...এবং নবীগণ (এ ধরনের বিষয়ে) ভুল থেকে মুক্ত।অতএব, সূর্য স্থির থাকার বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহকে অস্বীকার করছে। এবং এটি কাফেরদের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বেশিরভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানীই অজ্ঞ। জ্বি।

দেখুনঃ https://youtu.be/y35l-UQHkuE?feature=shared

৯) বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ইয়েমেনে সালাফী দাওয়াতের মুজাদ্দিদ ইমাম মুকবিল বিন হাদী আল-ওয়াদিঈ রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ১৪২২হিজরী/২০০১ঈসায়ী] তাঁর বক্তব্যে বলেন:

পৃথিবী গতিশীল কিনা (প্রশ্ন) হিসেবে, এটি এমন একটি বিষয় যার জন্য কিতাব বা সুন্নাহ (প্রমাণ) নিয়ে আসেনি। বরং যে এর সাথে বলে সে কুফরের কাছাকাছি, কারণ সে জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর প্রতি (কিছু)আরোপ করে এবং যা পাওয়া যায় (কুরআন সুন্নাহতে) তাও প্রত্যাখ্যান করে। প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে (পৃথিবীর গতির জন্য) মহান আল্লাহর বাণীঃ আর তুমি পাহাড়সমূকে দেখছ, সেগুলোকে তুমি স্থির মনে করছ। অথচ তা মেঘমালার ন্যায় চলতে থাকবে। (এটা) আল্লাহর কাজ. যিনি সব কিছু দৃঢ়ভাবে করেছেন..” (২৭:৮৮)

তাহলে এটি একটি ভুল যুক্তি (প্রমাণের ব্যবহার) কারণ এই আয়াত বিচার দিবস সম্পর্কে। জ্বি।

দেখুনঃ https://youtu.be/OTjJS-jClJI?feature=shared

সুতরাং, শায়খ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন পৃথিবীর গতির পক্ষে কিতাব সুন্নাহতে কিছু প্রমাণ নেই। এবং কেউ পৃথিবীর গতির পক্ষে বললে সেটা কুফরের কাছাকছি চলে যেতেও পারে, কারণ সে পৃথিবীর স্থির থাকার পক্ষে যেসব দলিল রয়েছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আলহামদুলিল্লাহ। এরকম স্পষ্ট বক্তব্যগুলো আমরা আমাদের আহলুস সুন্নাহর 'আলিমদের থেকেই আশা রাখি।

১০) শায়খ একই বক্তব্যের শেষাংশ:

<u>প্রশ্নকারী:</u> কেউ যদি বলে, “আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই যে এটি গতিশীল, তাই আমরা এর জন্য বাহ্যিক উৎসের দিকে তাকাই..."

<u>শায়খ:</u> বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, এবং যা পর্যবেক্ষণ করা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে, তাহলে আমরা পৃথিবীকে গতিশীল দেখতে পাই না। এ কারণে আমরা বলেছি যে সে (যে ব্যক্তি পৃথিবীর গতির সাথে কথা বলে) সে কুফরের কাছাকাছি, কারণ এই বক্তব্যটি দার্শনিক ও ইসলামের শত্রুদের কাছ থেকে এসেছে এবং এর জন্য কিতাব বা সুন্নাহ কোনটিই [প্রমাণ] নিয়ে আসেনি।

তিনি বলেছেন: “যদিও এটি বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়?” এখানে সমস্যা হল যে এটি সম্পূর্ণরূপে তাত্ত্বিক(থিওরি), কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে থেকে দার্শনিকদের শাখা এবং তাদের ছাত্ররা [এই তত্ত্বগুলি] গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মনে করে। কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক। এবং কতগুলো তত্ত্ব যা তারা দাবি করে এবং তারপর কিছুক্ষণ পরে তারা সেগুলো প্রত্যাহার করে....তারপর তাদের শাখাগুলোও প্রত্যাহার করে, অথবা তারা প্রত্যাহার করে না।

দেখুনঃ https://youtu.be/dk_dGpDfz2c?feature=shared

১১) শায়খ বানদার আল খাইবারি হাফি যাহুল্লাহর বক্তব্য–

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করেন পৃথিবী কি স্থির নাকি কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে? এটা নড়ে নাকি স্থির থাকে?

আমাদের উলামা ইমাম ইবনে বাজ এবং শেখ সালেহ আল-ফাওজান যে সত্যটি বর্ণনা করেছেন তা হল পৃথিবী স্থির এবং নড়ে না। এটি কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং এটি অর্থপূর্ণও।

দেখুনঃ https://youtu.be/xXQaMXudSk4?feature=shared

(বক্তব্যের কিছুটা অংশ এখানে আনা হয়েছে, পুরো শুনতে লিঙ্কে যান)

সুতরাং, দেখতে পেলেন সুস্পষ্ট শারঈ দলীলগুলো পৃথিবীর স্থিরতার পক্ষেই রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষেও পৃথিবী স্থির। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর গতি কোন পরীক্ষণেই প্রমাণিত নয়। এপর্যন্ত চারটি পরীক্ষনের **[Michelson-Morely experiment, Michelson- Gale experiment, Airy's failure, The Sagnac experiment]** প্রতিটির ফলাফলই স্থির-নিশ্চল পৃথিবীর অনুকূলে। তাই সত্য জানার পর কারো জন্য এটা উচিত হবে না এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে সেই কুফফার কল্পবিজ্ঞানীদের দেওয়া মিথ্যাচারগুলোকে বুকে লালন করা।

ইমাম কুরতুবি রঃ (৬৭১হি.) বলেছেন, ❝আহলে-কিতাব ও মুসলিমদের বক্তব্য হলো,পৃথিবী স্থির ও নিশ্চল। এটি কেবল ভূমিকম্পের সময় নড়ে ওঠে।❞

[তাফসীর আল-কুরতুবী ৯/২৪৫]।

৫. পৃথিবী সমতল

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পৃথিবীর আকৃতি ও সৃষ্টিগত ব্যাপারে একেবারে সহজ এবং নির্ভুল সত্য শব্দগুলোকেই বলেছেন। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে পৃথিবীকে বিছানাস্বরুপ বলেছেন এবং বলেছেন একে তিনি সমতলে বিছিয়েছেন। এবং বিচার দিবসে এই যমীনের উপর বন্ধুরতা সৃষ্টিকারী পর্বতগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবেন, ওইরূপ সমতলতা সৃষ্টি করবেন যাতে কেউ আড়াল করবার সামান্য কিছুও পাবে না।

পৃথিবী কোন গ্রহ নয়। এটি মহান আল্লাহর সুবিশাল সৃষ্টি:-

নীচের আয়াতগুলো পড়ে দেখুন। তাহলে বুঝতে পারবেন পৃথিবী কত বিশাল সৃষ্টি। আর অপবিজ্ঞানীরা কতবড়ো মিথ্যাবাদী।

পৃথিবী একসময় আসমানের সাথে মিশে ছিল-

১) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

❝কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একসঙ্গে মিলিত ছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি?❞ [২১:৩০]

তাফসীরে জাকারিয়া:

সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন এর অর্থ হচ্ছেঃ আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিত ছিল তারপর আমরা সে দুটিকে পৃথকীকরণ করেছি। হাসান ও কাতাদা রঃ বলেন: এতদুভয়ের মধ্যে বাতাস দ্বারা পৃথকীকরণ করেছেন।

ভাবুন তো: একটা ক্ষুদ্র বালুকণা বিশা--ল আকৃতির বস্তুর সাথে মিশে থাকতে পারে?

সেন্ডউইচ খাইছেন তো? আমি অবশ্য কোনোদিন খায়নি! সেন্ডউইচের দুটা পার্ট থাকে, মাঝখানে থাকে ক্রিম বা অন্য কিছু, পার্ট দুটা মিলিত

থাকে। তো একটা পার্ট আরেকটা পার্ট থেকে কি খুব বেশি ছোট বড় হয়? কমন সেন্স কি বলে?

২) আল্লাহর কুরসীর বিশালতা বুঝানোর জন্য আল্লাহ পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন। কেন? এটা কি পৃথিবীর বিশালতা ইঙ্গিত করে না?

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

❝তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম।❞ [২:২৫৫]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হি):

আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কুরসী, আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী সুবিস্তৃত। তবে বিশ্লেষণকারীরা অত্র আয়াতে উল্লিখিত কুরসীর অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান।

অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড় যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। *[তাফসীরে জাকারিয়া]*

৩) জান্নাতের বিশালতা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ ﷻ পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার মানে কি পৃথিবী মহাশুন্যে ভাসমান এক অতি ক্ষুদ্র গ্রহ ???

মহান আল্লাহ বলেন:

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

❝তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।❞ [৩:১৩৩]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হি):

আর দ্রুতগামী হও এমন জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃত আসমান জমিনের ন্যায়। সাত আসমান ও সাত যমীনের প্রত্যেক স্তরকে একটির সাথে আর একটিকে পরপর মিলিয়ে নিলে যা প্রশস্ত হবে, সে জান্নাতের প্রশস্ততাও তদ্রুপ হবে।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবী সমান। আকাশ ও পৃথিবীর চাইতে বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে জান্নাতের প্রস্থতাকে এ দু' টির সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা আকাশ পৃথিবীকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। *[তাফসীরে জাকারিয়া]*

৪) আকাশের মতো পৃথিবীরও সংখ্যা সাতটি। যেগুলো একটির নীচে আরেকটি স্তরে স্তরে রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الۡاَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ ؕ یَتَنَزَّلُ الۡاَمۡرُ بَیۡنَهُنَّ

❝আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও অনুরূপ, ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ...❞ [৬৫:১২]

তাফসীরে কুরতুবী (৬৭১হি):-

জমহুর আলিমগণের মতে, সাত জমিন একটি আরেকটির উপরে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের মাঝে যত ব্যবধান, দুই জমিনের মাঝেও আছে অনুরূপ ব্যবধান। প্রত্যেক জমিনে আল্লাহর সৃষ্টি আবাদ রয়েছে।"

দাহহাক রঃ বলেন: “সাত জমিন একটি আরেকটির উপরে। কিন্তু সাত আসমানের মতো এদের মাঝে ফাঁকা নেই।

যেহেতু সাতটি পৃথিবীর মধ্যে ফাঁক আছে কি নেই সেটা ইখতিলাফি বিষয়ে, তাই এটাকে আপাতত পাশে রাখলাম। যেটাতে সবাই একমত সেটাই নিলাম - সেটা হলো সাতটি পৃথিবী একটির নীচে আরেকটি স্তরে স্তরে রয়েছে।

এবার খেয়াল করুন। সাতটি পৃথিবী একটির নীচে আরেকটি থাকা পৃথিবী সমতল হওয়ার পক্ষে একটা বড়ো দলিল। কেননা প্রচলিত কল্পিত সৌরজগতে পৃথিবী বলতে একটি ভাসমান ছোট্ট গ্রহকে বোঝায় যার নিচে শুধু শূন্য আর শূন্য। এবং একটা ফুটবলের নিচে আরো ছয়টা ফুটবলের স্তরে স্তরে অবস্থান করার বিষয়টা পুরোটাই অযৌক্তিক। স্তরে স্তরে থাকার বিষয়টি কেবল সমতল জিনিসের ওপরই খাটে, যেহেতু সাতটি পৃথিবী একটির নিচে আরেকটি স্তরে স্তরে রয়েছে সেহেতু এটা প্রমাণিত যে পৃথিবী অবশ্য অবশ্যই সমতল।

নীচের হাদীসটি লক্ষ্য করুন, বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন:

নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারোর জমির সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করবে,

مَنْ أَخَذَ مِنْ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ

❝ক্বিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের নিচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে❞

[ছহীহ বুখারী, হা/২৪৫৪, ৩১৯৬]

উপরের এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় জমিন সাতটি একটা আরেকটার নিচে অবস্থিত। আর এটা প্রমাণ করে যে সাতটি পৃথিবী সমতল। কারন কাফেরদের শয়তানি থিওরি মুতাবেক এই বলের মতো পৃথিবীতে যদি আপনাকে চাপ দেওয়া হয় তাহলে আপনি পরের জমিনে না গিয়ে সোজা কথিত মহাকাশে চলে যাবেন। সুতরাং, সাতটি পৃথিবীর একটির নীচে আরেকটি স্তরে স্তরে অবস্থান করার মানেই হলো সাতটি পৃথিবী সমতলে বিছানো।

সুতরাং, পৃথিবীকে ছোট্ট গ্রহ দাবি করা কল্পবিজ্ঞানীদের চরম মিথ্যাচার। রহমানের আয়াত স্পষ্ট আমাদের পৃথিবীর বিশালতার ইঙ্গিত দেয়।

এই বিষয়ে শায়খ হামুদ আত-তুওয়াইজিরী রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ১৪১৩হিজরী] বলেন:

পৃথিবীকে গ্রহ বলে ডাকা একটি ভুল এবং গোমরাহী।

❝পৃথিবীকে 'গ্রহ' বলা একটি ভুল এবং গোমরাহী। যারা এটিকে 'গ্রহ' বলে ডাকে তারাই দাবি করে যে এটি অন্যান্য গ্রহের মতো গতিশীল এবং এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তারা ইউরোপীয়দের মধ্যে আধুনিক

জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং যারা অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করে এবং অজ্ঞ মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের পথ গ্রহণ করে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মূর্খ অন্ধ অনুসারীরা ছাড়া এটি আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা বলেছেন এবং আল্লাহর রাসুল ﷺ এবং সমস্ত মুসলিমরা একে যা বলে তার বিপরীত।........আল-কুরতুবী তার তাফসীরে বলেছেন যে পৃথিবীর আকাশ একটি ভবনের ছাদের মতো। ❞

দেখুনঃ https://abuiyaad.com/a/tuwayjuri-earth-planet
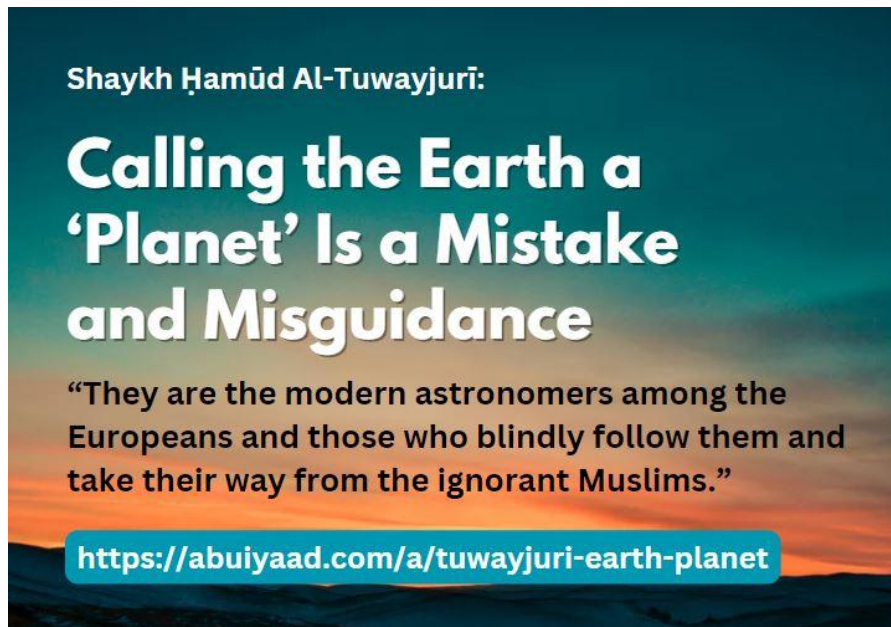
পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত যেগুলো সমতল পৃথিবীর বর্ণনা দেয়:-

আল্লাহ ﷻ একাধিক আয়াতে বলেন:

الَّذِىۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً

❝ যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ... ❞ [২:২২]

وَ هُوَ الَّذِىۡ مَدَّ الۡاَرۡضَ

❝ আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন... ❞ [১৩:৩]

الَّذِىۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ مَهۡدًا

❝ যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বানিয়েছেন শয্যা.. ❞ [৪৩:১০]

وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا

❝ আর আমরা বিস্তৃত করেছি যমীনকে... ❞ [৫০:৭]

وَ الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ

❝ আর যমীন, আমরা তাকে বিছিয়ে দিয়েছি, অতঃপর কত সুন্দর ব্যবস্থাপনাকারী (আমরা)! ❞ [৫১:৪৮]

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا

❝ আমরা কি করিনি যমীনকে শয্যা ❞ [৭৮:৬]

وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا

❝ আর যমীনকে এর পর বিস্তৃত করেছেন। ❞ [৭৯:৩০]

وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

❝ আর যমীনের দিকে, কীভাবে তা সমতল করা হয়েছে? ❞ [৮৮:২০]

وَ الْاَرْضِ وَ مَا طَحٰهَا

❝ শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার ❞ [৯১:৬]

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا

❝ আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিস্তৃত ❞ [৭১:১৯]

<u>আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো:</u>

১. {فِرَاشًا} - ফিরাশান - শয্যা (যার ওপর ঘুমানো যায়, যেমন: বিছানা)

২. {مَدَّ} - মাদ্দা - বিস্তৃত করা বা প্রসারিত করা।

৩. {مَهْدًا} - মাহদান- সুস্থির বিছানা বা শয্যা।

৪. {مَدَدْ} - মাদাদ - বিস্তৃত করা।

৫. {مِهٰدًا} - মিহাদান - বিছানাস্বরুপ ।

৬. {دَحٰىهَا} - দাহাহা - তা বিস্তৃত করা।

[আহলে আরবদের পরিভাষায় مد ও دحو শব্দের অর্থ হলো بسط বা বিস্তৃত -তাফসীরে তাবারি]

৭. {سُطِحَتْ} - সুতিহাত - বিস্তৃত বা সমতল করা।

৮. {طَحٰهَا} - তহাহা - তা বিস্তৃত করা।

৯. {بِسَاطًا} - বিসাতা - বিছানাস্বরুপ।

মহান আল্লাহ পৃথিবীকে কখনো প্রসারিত, কখনো বিস্তৃত, কখনো বিছানা, কখনো সমতল - এইসব শব্দগুলোই বলেছেন। আর উপরের প্রত্যেকটা শব্দ একটা জিনিসের দিকেই ইঙ্গিত করে তাহলো - সমতল। বিস্তৃত মানেও সমতল বোঝায়, বিছানা মানেও সমতল বোঝায়, আর কেবল সমতল জিনিসকেই প্রসারিত করা হয় বা বিছানো হয় বা ছড়ানো হয়। গোল জিনিসকে কখনো ছড়ানো বা বিছানো থাকা বলে না।

ইমাম যাহাবী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ *'আল-উলুউবু লিল আলিয়্যিল গাফফার'*-এ বলেন:

'আল্লাহর বান্দা! তুমি যদি ইনসাফ চাও, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তির কাছে থামো। তারপর তুমি দেখো, এই আয়াতসমূহের ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈন ও তাফসীরের ইমামগণ কী বলেছেন এবং সালাফের কী মতামত উদ্‌ধৃত করেছেন। অতঃপর তুমি ইলমের সাথে কথা বলবে, নচেৎ ধৈর্যের সাথে চুপ থাকবে।'

[সালাফী হও সত্যিকারের]

যেহেতু স্পষ্ট শব্দগুলো সমতলের পক্ষেই রয়েছে, সেহেতু কেউ আয়াতগুলোর রূপক ব্যাখ্যা কেউ দাঁড় করাতে চাইলে তাঁকে সালাফদের থেকে প্রমাণ পেশ করতে হবে। মূলত আরববিশ্বে গ্রীকদর্শন নামক ফেতনা প্রবেশের পূর্ববর্তীদের থেকে।

এই জায়গাতে অপবিজ্ঞানিদের কল্পিততত্ত্বে প্রভাবিত ভাইয়েরা বলেন এগুলোতে পৃথিবীর কিছুটা অংশকে ইঙ্গিত করছে, গোটা পৃথিবীকে নয়। অর্থাৎ একটা গোলক যদি বিশাল বড়ো আকারের হয় তাহলে তার প্রত্যেক ছোট অংশ সমতল হবে।

আমি তাঁদের বলি: আপনি কি এইটা বলতে চাচ্ছেন যে মহান আল্লাহ বারবার সমতল বোঝায় এমনকিছু শব্দ বলেছেন একটা গোলাকার পৃথিবীকে বোঝানোর জন্য!? সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে কি এমনকিছু আছে প্রমাণ আছে যে তাঁরা এইসব আয়াতের রূপক অর্থ নিয়েছিলেন যেমন আজকের গোল সমর্থনকারীরা নেয়!?

গোল সমর্থনকারীরা যেগুলো দেখায় সেগুলো আকলের যুক্তি, সাহাবায়ে কেরামদের (রাদি.) থেকে এগুলোর প্রমাণ নেই। বরং পবিত্র কুরআনে পৃথিবীকে বোঝাতে প্রতিটিবারই সেই শব্দগুলো এসছে যেগুলোর প্রকাশ্য অর্থ সমতলকেই বোঝায়।

তাই শায়খ সালিম আত-তাওয়িল হাফিযাহুল্লাহ বলেন:

❝ কুরআনের আয়াতগুলোর যাহির অর্থ সমর্থন করে যে পৃথিবী সমতল, গোলাকার নয়। ❞

দেখুনঃ https://youtu.be/RL1slQHbM6o?feature=shared

* শায়খ খলিদ ঈসমাঈল হাফিযাহুল্লাহ উল্লেখ করেন:

"প্রাথমিক যুগের সালাফদের বক্তব্য ছিল পৃথিবী সমতল।"

যেমন আল্লাহ বলেছেন,

وَ اِلَى الۡاَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ

"আর যমীনের দিকে, কীভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে?" (৮৮:২০)

(সুতিহাত, দাহাহা) ইত্যাদি শব্দগুলো গোলাকার পৃথিবীতে প্রকাশ করা সম্ভব না। (দাহাহা) পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মত ছড়িয়ে দিয়েছেন যেটা সম্ভব নয়।

এটি পবিত্র কুরআনের একটি শব্দ, যার ভিন্ন তাফসীর করা তাকদীব(প্রত্যাখ্যান/অবিশ্বাস)। তাকে যদি বলা হয় গোলাকার কোন কিছু কখনোই সমতল মিন করে না তখন তিনি কি বলবেন?

কাফেরদের বানোয়াট সংবাদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না, সবকিছু বিশ্বাস করতে পারি না। তারা বলে গোলাকার, ঘুরছে অথচ কুরআনে আপনি বিপরীতে বাহ্যত এমন আয়াত পাবেন যা তাদের সিদ্ধান্তের বিপরীত।

অতএব আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। কারণ কুরআনের আয়াত যাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেখুনঃ
https://www.facebook.com/share/v/CrVZ6Z9Rb8doRSYj/?mibextid=oFDknk

পৃথিবী সমতলের পক্ষে সাহাবা-তাবেঈ- পূর্ববর্তী মুফাসসিরিনদের তাফসীর:-

১) মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۪

❝যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন...❞ [২:২২]

তাফসীরে তাবারি (৩১০ হিজরী):-

* মূসা বিন হারুন........ ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ এবং নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবীর থেকে বর্ণনা করেছেন, এটি একটি فراش (অর্থাৎ বিছানাস্বরুপ) যার উপর আপনি হাঁটেন এবং এটি হল مِهَاد (অর্থাৎ শয্যা বা সমতল ভূমি) এবং قرار (অর্থাৎ দৃঢ় এবং স্থির স্থান)।

* বিশর ইবনে মুআয আমাদের বর্ণনা করেছেন......কাতাদাহ থেকে। তিনি বলেন: তোমার জন্য একটি مِهَاد (অর্থাৎ শয্যা বা সমতল ভূমি)।

তাফসীরে আদ দুররুল মানসুর (৯১১হিজরী):

* ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিম তাঁর বাণী সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রাঃ এবং কয়েকজন সাহাবীদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন:

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا

তিনি বললেন: "এটি একটি فراش (অর্থাৎ বিছানা) যার উপর আপনি হাঁটেন। এবং এটি হল مِهْد (অর্থাৎ বিছানা বা সমতল ভূমি) এবং القرار (অর্থাৎ দৃঢ় ও স্থির স্থান)। এবং আকাশ হল ছাদ। তিনি বলেন: তিনি পৃথিবীর উপর আকাশকে গম্বুজের আকৃতিতে নির্মাণ করেছেন এবং এটি পৃথিবীর ছাদ।

* আবদ ইবন হুমাইদ এবং আবু আশ-শেখ 'আল-আযামাহ'-তে ইইয়াস বিন মুয়াবিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আকাশ পৃথিবীর উপর গম্বুজের মতো বিস্তৃত।

* আবু আশ-শাইখ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: আকাশের প্রান্তের অংশ পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে এবং সমুদ্রগুলি তাঁবুর প্রান্তের মতো।

তাফসীরে বাগাওয়ী (৫১৬হিজরী):

"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা" যার অর্থ বিস্তৃত {بساطاً}।

২) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ هُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَ اَنْهٰرًا

❝আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন..❞ [১৩:৩]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হিজরী):

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন: আল্লাহই পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন {بسطها} এবং একে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বিস্তৃত করেছেন।

তাফসীরে মাওয়ারদী (৪৫০হিজরী):

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: 'এবং তিনিই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন,' এর অর্থ তিনি এটিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন {بسطها} তার উপর বসতি স্থাপন করার জন্য, এটি তাদের রদ করে যারা দাবি করে যে এটি একটি বলের মতো গোলাকার।

তাফসীরে ইবনে আতিয়া (৫৪১হিজরী):

এবং তিনি বলেন 'পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন' এটা বোঝায় যে এটি সরল {بسيطة}, এবং বলের মত নয়। এটা শরিয়তের সুস্পষ্ট বিষয়।

তাফসীরে কুরতুবী (৬৭১হিজরী):

'এই আয়াতে, তাদের রদ করে যারা দাবি করে যে পৃথিবী একটি বলের মতো...'

তাফসীরে আদ-দুররুল মানসুর (৯১১হি):

আবূ আশ-শাইখ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: মহান আল্লাহ যখন সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন তিনি বায়ু সৃষ্টি করলেন তারপর পানিকে টেনে নিয়ে গেলেন, ফলে একটি সামুদ্রিক শিলা উদগত হলো এবং সেটি মাটির নিচে। এবং সেখান থেকে পৃথিবীকে তিনি ইচ্ছেমত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্তে ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তা নড়াচড়া করত তাই তিনি পর্বতমালাকে স্থাপন করলেন।

৩) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا

❝আর আল্লাহ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিস্তৃত করেছেন❞ [৭১:১৯]

তাফসীর ইবনে আতিয়া (৫৪১হি):

* পৃথিবী গোলাকার এই মতটি মিথ্যা, কিন্তু এটাকে সমতল বিশ্বাস করাই আল্লাহর কিতাব থেকে নেওয়া সুস্পষ্ট অর্থ, যার কোন মিথ্যা নেই।

তাফসীরে কুরতুবী (৫১৬ হিজরী):

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, "এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন" এর অর্থ مبسوطة (অর্থাৎ প্রসারিত)।

তাফসীরে বাগাওয়ী (৫১৬হিজরী):

"এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত করেছেন", তিনি তা বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন।

৪) আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

❝ এবং (তারা কি তাকায় না) পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে? ❞ [৮৮:২০]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হিজরী):

বিশর>>ইয়াযীদ>>সাঈদ>>কাতাদার সূত্রে বর্ণিত: "এবং পৃথিবীকে, কীভাবে এটিকে সমতল করা হয়েছে": এর অর্থ, এটি সম্প্রসারিত করা {بُسطت} হয়েছিল।

তাফসীরে ইবনে আতিয়াহ (৫৪৬ হিজরি):-

স্পষ্টত এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, পৃথিবী সমতল; বলের মতো (গোলাকার) নয়। এটিই আহলুল ইলমের অভিমত।

তাফসীরে সা'লাবি (৪২৭হিজরী):

وظاهر الآية أن الأرْضَ سَطح لا كرة

এবং আয়াতে এটা স্পষ্ট যে পৃথিবী সমতল, গোলাকার নয়।

তাফসীরে কুরতুবী (৫১৬ হিজরী):

"এবং পৃথিবীকে, কীভাবে এটিকে সমতল করা হয়েছে": অর্থাৎ, এটি

বিস্তৃত ও প্রসারিত

(بُسطت ومدّت)।

তাফসিরে জালালাইন: (৮৬৪ হিজরি):

"এই আয়াতে 'সুতিহাত' শব্দ দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে, পৃথিবী সমতল। আর এটিই শরিয়তের আলিমগণের অভিমত। পৃথিবীকে গোলাকার দাবী করা ভূতত্ত্ববিদদের কথা সঠিক নয়।"

তাফসীরে শাওকানী (১২৫০ হিজরী):

অর্থাৎ এটা প্রসারিত {بسطت}। "সাতাহা" {سطح} হলো কোনো কিছুর সম্প্রসারণ।

তাফসীরে বাগাওয়ী (৫১৬হিজরী):

আতা’ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেনঃ আমি ছাড়া আর কেউ কি উটের মত কিছু সৃষ্টি করতে পারে, বা আকাশের মত কিছু তুলতে পারে, বা পাহাড়ের মত কিছু খাড়া করতে পারে বা পৃথিবীর মত সমতল করতে পারে?

৫) মহান আল্লাহ বলেন:

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا

❝আমরা কি করিনি যমীনকে শয্যা❞ [৭৮:৬]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হিজরী):

ইবনে হামিদ আমাদেরকে বলেছেন, তিনি বলেছেন: মাহরান আমাদেরকে সাঈদের সূত্রে এবং কাতাদার সূত্রে বলেছেন: "আমরা কি করিনি যমীনকে শয্যা" অর্থাৎ একটি কার্পেট বা বিছানা {بساطاً}।

তাফসীরে আদ দুররুল মানসুর (৯১১হি):

আল-হাকিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন - এবং তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন - যিনি বলেন: আল্লাহ যখন সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন তিনি একটি বায়ু প্রেরণ করেন যার ফলে জল প্রবাহিত হয়েছিল যতক্ষণ না এটি একটি সামুদ্রিক শিলা প্রকাশ করে। আর সেটা কাবাঘরের নিচে। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করলেন (مَدَّ) যতক্ষণ না তা আল্লাহর ইচ্ছামত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পৌঁছায়। এবং এটি এভাবে দুলতে থাকে এবং তিনি তার হাত দিয়ে দেখলেন এভাবে এভাবে। তাই আল্লাহ পাহাড়কে নোঙ্গর ও খুঁটি হিসাবে তৈরি করলেন এবং আবু কুবাইস ছিল পৃথিবীতে স্থাপন করা প্রথম পর্বত।

৬) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ الۡاَرۡضَ مَدَدۡنٰهَا وَ اَلۡقَیۡنَا فِیۡهَا رَوَاسِیَ

❝আর পৃথিবী, আমি সেটাকে বিছিয়ে দিয়েছি আর তাতে পর্বতরাজি সংস্থাপিত করেছি...❞ [১৫:১৯]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হি):

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন যে: {আর পৃথিবী, আমি সেটাকে বিছিয়ে দিয়েছি} এবং পৃথিবীকে সমতল করেছি এবং ছড়িয়ে দিয়েছি ।

তাফসীরে কুরতুবী (৬৭১হি):

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: "আমি পানিপৃষ্ঠের উপর পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি"। যেমন তিনি বলেছেন: "এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন" (৭৯:৩০) অর্থাৎ তিনি তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন: "আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কতইনা সুন্দর বিছানা প্রস্তুতকারী" (৫১:৪৮)। তিনি তাদের জবাব দেন যারা দাবি করেন যে এটি একটি বলের মতো।

তাফসীরে আদ দুররুল মানসুর (৯১১হি):

আবদ ইবনে হামিদ, ইবনে জারীর, ইবনে আল-মুনযির এবং ইবনে আবি হাতেম (সকলেই) কাতাদার রাঃ সূত্রে বর্ণনা করেছেন তার বাণী সম্পর্কে: {আর পৃথিবী, আমি সেটাকে বিছিয়ে দিয়েছি,} তিনি বলেছেন: সর্বশক্তিমান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন : "আর যমীনকে এরপর বিস্তৃত করেছেন" [৭৯:৩০]। তিনি বলেন: আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছিল যে উম্মুল কুরা হল মক্কা এবং এর নীচ থেকে পৃথিবীকে সমতল করা হয়েছিল।

তাফসীরে শাওকানী (১২৫০হি):

ইমাম শাওকানী রঃ বলেন,

বিস্তৃত করা (مددناها): "অর্থাৎ আল্লাহ তা বিস্তৃত করলেন এবং পানির মুখের উপর সমতলে স্থাপন করলেন যেমন তিনি বলেছেন "এবং এর পরে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন" (৭৯:৩০) এবং "আর পৃথিবী আমরা তাকে বিছিয়ে দিয়েছি, অতঃপর কত সুন্দর ব্যবস্থাপনাকারী (আমরা)!" (৫১:৪৮) এবং এটি একটি পাল্টা দলিল যারা দাবি করে যে এটি একটি বলের মতো।"

৭) মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا

❝ এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। ❞ [৭৯:৩০]

এটা সেই আয়াত যাকে অপব্যাখ্যা করে বলের পক্ষে দাঁড় করিয়েছেন অনেকেই। "দাহাহা" এর অর্থ বিকৃত করে উটপাখির ডিম বানানো হয়েছে।

তাফসিরে তাবারি (৩১০হি.):

"আরবদের ভাষায় 'দাহাহা' শব্দের অর্থ হলো, বিছিয়ে দেওয়া ও বিস্তৃত করা।"

* আলী>>আবূ সালিহ>>মুয়াবিয়া>>আলী>> ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্পাক যেখানে আসমান সৃষ্টির পূর্বে যমীন সৃষ্টির কথা বলেছেন, বা যমীন সৃষ্টির পূর্বে আসমান সৃষ্টির কথা বলেছেন এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্পাক যমীনকে বিস্তৃত করার পূর্বে এর মূল অংশকে আসমান সৃষ্টির আগে তৈরি করেন। অতঃপর তিনি আকাশকে সপ্তস্তরে বিন্যাস করার পর যমীনকে বিস্তৃত (دَحَا) করেন। এটাই "এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন" - এর অর্থ।

* ইবনু হামিদ>>ইয়াকুব>>হাফসা>> ইকরিমা>>ইবনু আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়া সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন চারটি স্তম্ভের উপর তাঁর ঘর বা বায়তুল্লাহর বুনিয়াদ পানির উপর স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহর নীচ থেকে ক্রমান্বয়ে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করেন।

* ইবনু হুমাইদ>>মাহরান>>সুফিয়ান>>আল-আ'মাশ>>বুকাইর ইবনুল আখনাস>>মুজাহিদ>>আবদুল্লাহ ইবন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা ঘরকে পৃথিবীর দুই হাজার বছর আগে সৃষ্টি করেছেন। এবং তা থেকে (তাঁর নীচ থেকে) পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন।"

* বাশার>>ইয়াযীদ>>সাঈদ>>কাতাদাহ রঃ হতে বর্ণনা করেছেন যে, অর্থাৎ 'তিনি তা ছড়িয়ে দিয়েছেন।' (বা এটিকে বিছিয়ে দিয়েছেন/বিস্তৃত করেছেন)

* মুহাম্মাদ বিন খালাফ>>রওওয়াদ>>আবি হামযা>>আস সুদ্দি রঃ হতে বর্ণনা করেছেন যে, {دَحَاهَا} শব্দের অর্থ হলো 'তিনি তা ছড়িয়ে দিয়েছেন' {بسطها}।

* ইব্ন বাশার......হতেও একইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তাফসীরে আদ দুররুল মানসুর (৯১১হি):

আবদ ইবনে হুমাইদ আতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমাকে জানানো হয়েছিল যে, কাবার নিচ থেকে পৃথিবী বিস্তৃত করা হয়েছিল।"

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আকাশের পূর্বে। কিন্তু তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পর।

তাফসীরে কুরতুবী (৬৭১হিজরী):

"এবং এর পরে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন," অর্থাৎ, তিনি তা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

৮) মহান আল্লাহ বলেন,

اَوَ لَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ

❝যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবেনা?❞ [২১:৩০]

তাফসীরে আদ দুররুল মানসুর (৯১১হি):

ইবনে আবী শায়বাহ, আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে আল-মুন্দির, ইবনে আবী হাতিম, আবু আশ-শাইখ রঃ "আল-আযামাহ"-তে (সকলেই) মুজাহিদ থেকে তাঁর বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন: {উভয়ই মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম}। তিনি বলেন, তিনি পৃথিবী থেকে এটাসহ আরও ছয়টি পৃথিবী বিভক্ত করেছেন এবং এগুলি হল সাতটি পৃথিবী যা একে অপরের নীচে রয়েছে। এবং আসমান থেকে এটাসহ ছয়টি আসমান বিভক্ত করেন এবং তা হলো সাতটি আসমান যা একে অপরের উপরে রয়েছে।

তাফসীরে জাকারিয়া:

সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন এর অর্থ হচ্ছেঃ আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিত ছিল তারপর আমরা সে দুটিকে পৃথকীকরণ করেছি। হাসান ও কাতাদা

রঃ বলেনঃ এতদুভয়ের মধ্যে বাতাস দ্বারা পৃথকীকরণ করেছেন। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

উপরের এই আয়াত কখনোই বিগ ব্যাং সাপোর্ট করেনা। বরং এটা সমতলের প্রতি একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে। পৃথিবী আকাশের সাথে মিশে ছিল, এটা তখনই সম্ভব যখন পৃথিবী বিশাল সমতল হবে, নচেৎ একটা বিশাল আকাশের সাথে বালিকণার মতো ছোট্ট গ্রহ কিভাবে সাথে মিশে থাকে?

৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ الۡاَرۡضَ مَدَدۡنٰهَا

❝আর আমরা বিস্তৃত করেছি যমীনকে❞ [৫০:৭]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হিজরী):

এবং তাঁর বাণী: "এবং পৃথিবীকে আমরা বিস্তৃত করেছি" অর্থ: এবং পৃথিবীকে আমরা প্রসারিত করেছি {بسطناها}।

তাফসীরে শাওকানী (১২৫০হি):

আল-কিসায়ী বলেছেন: এতে কোনো পার্থক্য নেই, কোনো ইখতিলাফ নেই এবং কোনো বিভাজন নেই {আর আমরা বিস্তৃত করেছি যমীনকে} এর অর্থ: আমরা একে প্রসারিত করেছি বা ছড়িয়ে দিয়েছি {بسطناها}।

১০) আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا

❝শপথ পৃথিবীর এবং তার বিস্তীর্ণতার।”   [৯১:৬]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হিজরী):

"ত্বহাহা (طَحَنَهَا) অর্থ- তিনি পৃথিবীকে ডানে, বামে ও সর্বদিকে বিস্তৃত করেছেন।”

তাফসীরে কুরতুবী (৬৭১হি):-

আল-হাসান, মুজাহিদ এবং অন্যরা বলেছেন: তিনি এটিকে চ্যাপ্টা করেছেন এবং এটিকে সমতল করেছেন করেছেন।

(طحاها ودحاها)

যার অর্থ তিনি এটিকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন {بسطها}।

১১) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ سَارِعُوۡۤا اِلٰی مَغۡفِرَۃٍ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ جَنَّۃٍ عَرۡضُہَا السَّمٰوٰتُ وَ الۡاَرۡضُ ۙ اُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِیۡنَ

❝আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।❞ [৩:১৩৩]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হি):

আর দ্রুতগামী হও এমন জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃত আসমান জমিনের ন্যায়। সাত আসমান ও সাত যমীনের প্রত্যেক স্তরকে একটির সাথে আর একটিকে পর পর মিলিয়ে নিলে প্রশস্ত হবে, সে জান্নাতের প্রশস্ততাও তদ্রূপ হবে।

ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহপাকের বাণী-

جَنَّۃٍ عَرۡضُہَا السَّمٰوٰتُ وَ الۡاَرۡضُ ۙ اُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِیۡنَ

-এর ব্যাখ্যায় বলেন: জান্নাতের বিস্তৃতি হলো সাত আসমান ও সাত যমীনের পরিধির ন্যায়। সাত আসমান সাত যমীনের সাথে মিলিত হয় যেমন কাপড়ের সাথে কাপড় মিলিত হয়, এরূপই হবে জান্নাতের পরিধি।

তাফসীরে কুরতুবী (৬৭১হি):

এর ব্যাখ্যায় পণ্ডিতগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে একত্রে মিলিত করা করা হলে যেভাবে কাপড় বিছিয়ে একত্রিত করা হয়। এটি হবে জান্নাতের প্রস্থ, এবং এর দৈর্ঘ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত, এবং এটি অস্বীকার করা হয় না।

এর মানে কি পৃথিবী ছোট্ট একটা ফুটবল?? নাকি আকাশের ন্যায় বিশাল সৃষ্টি।

গোলাকার পৃথিবীর খন্ডন:-

১) • তাবি'ঈ ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রঃ (১১০হিজরী)- কে মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে সাতটি সমতল পৃথিবী... •

– আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু শুরাইহ আল-ইশাবানী (মৃ. ৩০৬ হিজরী) <– মুহাম্মদ ইবনু রাফি’ আল-নিসাবুরী (মৃ. ২৪৫ হিজরী) <– ইসমাইল ইবনু আবদ আল-করিম আল-ইয়ামানি (মৃ. ২১০ হিজরী) <– আবদ আল-সামাদ ইবনু মাকিল আল-ইয়ামানি (মৃ. ১৮৩ হিজরী):

"ওয়াহাবকে দুটি যমীন [পৃথিবী] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারা কেমন আছে? তিনি বললেনঃ সাতটি সমতল পৃথিবী যা দ্বীপ, প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানে একটি সমুদ্র এবং সবুজ সাগর সবগুলোকে ঘিরে আছে। আর সমুদ্রের ওপারে মন্দির।"

[আবু আশ-শায়খ আল ইসবাহানির রচিত কিতাব 'আযামাহ]

দেখুনঃ https://shamela.ws/book/13043/972#p1

২) ইমাম কাহ্তানী আল আন্দালুসী রঃ (৩৮৭হিজরি)- এর বিখ্যাত কবিতা *নুনিইয়াতুল কাহ্তানী*।

এটি এমন একটি কবিতা যা মুসলিম বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের আলেমদের কাছে পরিচিত এবং এর কিছু অংশ আজও তাদের ইসলামিক অধ্যয়নের অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়। কবিতাটিতে প্রায় ৭০০ টি লাইন রয়েছে (৬০০০ টিরও বেশি শব্দ) ইসলামের অনেক দিককে কভার করেঃ কুরআন, ‘আক্বিদাহ, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস, সীরাহ ইত্যাদি। এটি অনেক ধর্মতাত্ত্বিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলোকেও স্পষ্ট করে দেয় যা সেই সময়ে উম্মাহ (যেমন মু’ তাজিলার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেইসাথে অন্যান্য বিধর্মী গোষ্ঠীর দ্বারা আনীত সমস্যা) এবং এটি ক্রমাগত সুন্দর উপদেশ দেয় যে মুসলিমদের কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত - যেমন আপনার ভাইদের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন, কীভাবে আপনার চরিত্রকে নিখুঁত করবেন, কীভাবে জীবনে অর্জন করবেন ইত্যাদি।

[This aqeedah in poetry form by the Imaam and Scholar al-Qahtaanee of Spain from the middle ages. And excellent poem in establishing the Salafi creed and manhaj.]

https://www.salafisounds.com/nooniyyah-qahtaaniyy-the-aqeedah-in-poetry-form/

পৃথিবীর আকার নিয়ে দার্শনিকদের বিরোধিতা করে ইমাম কাহতানী আল আন্দালুসী রঃ তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'নুনিইয়াতুল কাহতানী' তে বলেন:

كذب المهندس والمنجم مثله

فهما لعلم الله مدعيان

الأرض عند كليهما كروية

وهما بهذا القول مقترنان

والأرض عند أولي النهي السطيحة

بدليل صدق واضح القرآن

والله صيرها فراشا للوري

وبني السماء بأحسن البنيان

والله أخبر أنها مسطوحة

وأبان ذلك أيما تبيان

অনুবাদ:

❝ প্রকৌশলী মিথ্যে বলেছে আর জ্যোতিষীও তার মত মিথ্যা বলেছে,

কারণ তারা আল্লাহর জ্ঞানের দাবিদার,

তাদের মতে পৃথিবী গোলাকার

এবং তারা উভয়েই এই বিশ্বাসকে মেনে চলে।

আর [বিচক্ষণ] জ্ঞানী লোকদের নিকট পৃথিবী সমতল

কুরআন থেকে সত্য ও স্পষ্ট প্রমাণসহ।

সৃষ্টিকুলের জন্য আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন,

সর্বোত্তম গঠনে বানিয়েছেন আসমান,

এবং আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে এটি সমতল

এবং তিনি তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।❞

[নুনিইয়াতুল কাহতানী, পৃষ্ঠা ২৯]

দেখুনঃ https://youtu.be/NZhr_caJwKE?feature=shared

বইটি ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://t.me/wasimsaikh03/120

৩) ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ৬৭১হিজরী] তাঁর তাফসীরে [১৩:০৩] আয়াত সম্পর্কে বলেন:

في هذه الآية ردا على من زعم أن الارض كالكرة

"এবং এই আয়াতটি তাদের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা দলিল যারা দাবি করে যে পৃথিবী একটি গোলকের মতো।....আহলে-কিতাব ও মুসলিমদের বক্তব্য হলো,পৃথিবী নিশ্চল ও প্রসারিত। এটি কেবল ভূমিকম্পের সময় নড়ে ওঠে।"

[তাফসীরে কুরতুবী ৯/২৪৫]

দেখুনঃ https://shamela.ws/book/20855/3611

৪) যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, আশ-শাইখুল ইসলাম, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ [মৃত: ৭২৮ হিজরী] রাহিমাহুল্লাহ থেকে পৃথিবী সমতলের কওল।

তিনি বলেন:

من الأجسام وهو الشعاع المنعكس على الأجسام المسطحة كالأرض

"[সূর্যের আলো] চকচক করে এবং পৃথিবীর মতো সমতল দেহে প্রতিফলিত হয়।"

[শারহ আকিদাতুল ইসফাহানি]

দেখুনঃ https://shamela.ws/book/11248/95

[অন্য জায়গায় তিনি রঃ গোলকারের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এর প্রকৃত কারণ মহান আল্লাহ ভালো জানেন।]

৫) ইমাম ইবনে মুলকিন রঃ একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং একজন শাফেয়ী ফকীহ।

তিনি এক কিতাবে বলেছেন:

لأن الأرض مسطحة

কারণ পৃথিবী সমতল।

(এরপর টিকাতে বলা হয়: সম্ভবত আমি লেখকের রঃ কথাগুলি বুঝতে পেরেছি যে, পৃথিবী সমতল, মানে এটি ডিম্বাকৃতি নয়....)

['ইউজালাতুল মুহতাজ' ইলা তাওজিহুল-মিনহাজ]

দেখুনঃ https://shamela.ws/book/20561/516

৬) ইমাম শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ১২৫০হিজরী] বলেন:

বিস্তৃত করা (مددناها) অর্থাৎ আল্লাহ তা বিস্তৃত করলেন এবং পানির মুখের উপর সমতলে স্থাপন করলেন যেমন তিনি বলেছেন "এবং এর পরে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন" (৭৯:৩০) এবং "আর পৃথিবী আমরা তাকে বিছিয়ে দিয়েছি, অতঃপর কত সুন্দর ব্যবস্থাপনাকারী (আমরা)!" (৫১:৪৮) এবং এটি একটি পাল্টা দলিল যারা দাবি করে যে এটি একটি বলের মতো।

[তাফসীরে শাওকানী]

দেখুনঃ https://shamela.ws/book/23623/1381#p1

৭) উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আহলুল হাদীস 'আলিম শায়খ নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালি রাহিমাহুল্লাহ [১৩০৭হিজরী] বলেন:

"আর যমীনকে এর পর বিস্তৃত করেছেন।" (৭৯:৩০)' এবং "আর যমীন, আমরা তাকে বিছিয়ে দিয়েছি, অতঃপর কত সুন্দর ব্যবস্থাপনাকারী (আমরা)!" (৫১:৪৮) এবং এতে তাদের একটি খণ্ডন রয়েছে যারা দাবি করে যে এটি একটি বলের মত।

[ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসিদ কুরআন]

দেখুনঃ https://shamela.ws/book/37458/4266

৮) ইমাম ইবনে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ৩২৪ হিজরী] বলেন:

لو كانت الأرض كروية لما استقر الماء عليها

"পৃথিবী যদি বলের মতো (গোলাকার) হতো, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন পানি থাকতো না।"

[তাফসীরে ইবনে আতিয়াহ ৫/৩৭৫]

দেখুনঃ https://shamela.ws/book/23632/2622#p1

৯) ইমাম আবু মানসূর আল বাগদাদী রঃ [মৃত: ৪২৯হিজরী] বলেন:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, 'পৃথিবী স্থির ও নিশ্চল। এটি কেবল ভূমিকম্পের সময় নড়ে ওঠে।' কিন্তু নাস্তিকদের বক্তব্য হলো, 'পৃথিবী (মহাশূন্যে) ভাসমান।'

তাঁরা (আহলুস সুন্নাহ) এই বিষয়ে ইজমা করেছেন যে, 'পৃথিবীর চারদিকে প্রান্তসীমা আছে, (অর্থাৎ পৃথিবী গোলাকার তথা বর্তুলাকার নয়, গোলকের প্রান্তসীমা থাকে না) একইভাবে আসমানেরও ছয় দিক থেকে সীমানা রয়েছে।'

তাঁরা আরো ইজমা করেছেন যে, 'আসমান পৃথিবীর চারপাশে, গোলাকার গঠন নয়।' কিন্তু অন্যরা দাবী করে, 'আসমানগুলো গোলাকার গঠন, যা একটি আরেকটির গর্ভে অবস্থিত। আর পৃথিবী হলো এই গোলাকার গঠনের কেন্দ্রস্থল'।"

[আল ফারকু বাইনাল ফিরাক লিল বাগদাদী]

তিনি অন্যত্রে বলেছেন:

আল বাসিত {الباسط} নির্দেশ করে যে তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করেন এবং তিনি পৃথিবীকে সমতলভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন, এই কারণেই তিনি এটিকে {بِسَاطًا}বিস্তৃতি বলেছেন, সেই দার্শনিক এবং জ্যোতিষীদের দাবির বিপরীতে যারা বলে যে পৃথিবী গোলাকার এবং সমতল নয়।"

[উসুল আল দীন, পৃষ্ঠা-১২৪]

দেখুনঃ
https://archive.org/details/osooluldeen/page/n123/mode/1up

১০) জালালুদ্দিন সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ৯১১হিজরী] তাঁর কিতাবে বলেন:

তাঁর বাণী "এবং পৃথিবীকে আমি বিস্‌তৃত করেছি" [১৫:১৯]। আল-কিরমানি বলেছেন: এটি প্রমাণ করে যে পৃথিবী সমতল এবং গোলাকার নয়।

[আল-ইকলিল ফি ইস্তিনবাত আত-তানযীল, ১৫:১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায়]

১১) শায়খ হামুদ আত-তুওয়ায়জিরী (রহ.) বলেন: "আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে এটা বলা ঠিক নয় যে, তিনি পৃথিবীকে গোল বল বানিয়েছেন, কারণ কুরআনে এমন কিছুই নেই। যে কোনও ক্ষেত্রে এটি ইঙ্গিত করে, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে।"

[মাজমু মুআল্লাফাত ওয়া রাসাইল আল-'আল্লামা আত-তুওয়ায়জিরী ৩/৪২৮]

১২) হারব ইবনে ইসমাঈল আল-কারমানি রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ২৮০হিজরী] তার *"আস-সুন্নাহ"* গ্রন্থে সৃষ্টি সংক্রান্ত বিশ্বাসের উপর আহলুস-সুন্নাহর ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

❝এবং আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সাতটি আসমান একে অপরের ওপরে এবং (সৃষ্টি করেছেন) সাতটি পৃথিবী একে অপরের নিচে। আর পৃথিবীর উচ্চতম এবং সর্বনিম্ন আকাশের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বছরের দুরত্ব এবং প্রত্যেক দুই আসমানের মধ্যে পাঁচশত বছরের দূরত্ব রয়েছে এবং সপ্তম আকাশের উপরে পানি এবং পানির ওপর আর-রহমান-আজ্জা ওয়া জাল্লার সিংহাসন রয়েছে। আর কুরসি হল তাঁর দুই পায়ের রাখার স্থান।❞

[উল্লেখ্য যে, সাত পৃথিবী একটির নীচে আরেকটি থাকার বিষয়টি কল্পিত হেলিওসেন্ট্রিজকে(সৌরজগৎ) প্রত্যাখ্যান করে]

১৩) শায়খ খালিদ ইসমাঈল হাফিযাহুল্লাহ এক বক্তব্যে বলেন:

"ইমাম আল-কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে মুসলমান ও আহলে কিতাবদের [ইহুদী, খ্রিস্টান] ইজমা বর্ণনা করেছেন যে পৃথিবী সমতল, গোলাকার নয় এবং তিনি এই আয়াতগুলো দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।"

শাইখ এখানে সূরা গশিয়াহ এর [১৭-২০] আয়াতের সালাফদের তাফসীর উল্লেখ করেন।

দেখুনঃ https://youtu.be/33pnRcYAtTw?feature=shared

মূল ভিডিওঃ

https://youtu.be/vvj99xpfzhU?si=IP2AtZPq40Nu0WCF

১৪) পৃথিবী সমতল নাকি গোলাকার প্রসঙ্গে শায়খ আমরু আব্দুল লতিফ রঃ কে প্রশ্ন করা হয়, জবাবে শায়খ রঃ বলেনঃ

❝ভাই মুহাম্মদের 'পৃথিবী গোলাকার নাকি সমতল' এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে চাই, প্রাচীন উলামাগন বলেছেন যমীন সমতল। "তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?" (৮৮:১৭-২০) এবং এরকমই সূরা শামসে বলা হয়েছেঃ "শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর।/ শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর," [সূরা শামসঃ৫-৬] বিস্তৃত করেছেন, সমান, সমতল করেছেন। এ বিশ্বাসের উপরেই ছিলেন সালাফ এর উলামাগন। তাদের মধ্যে কেউ এ ফতওয়াও দিয়েছেন, যে বলে পৃথিবী গোলাকার তাহলে তা কুফরি হবে। এজন্য প্রথমেই বলেছি মানুষ তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে যা তার জন্য মানানসই, যা তার লাভে আসে। কি দলিল আছে গোলাকৃতি পৃথিবীর ব্যপারে? ভূগোল শিক্ষায় আপনাকে শেখাবে, পাহাড়ের চূড়া থেকে কিংবা সাগরের উপর জাহাজের উপর থেকে দূরে তাকিয়ে, অথবা অবাস্তব কথিত স্যাটেলাইট থেকে দেখিয়ে বোঝাবে যে পৃথিবী গোলাকারা? এবং এটা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালাম, আর

সালাফদের তাফসীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? একে কি অগ্রহনযোগ্য করে দেয় না? এটাই কি মুসলিমদের বোধসম্পন্ন জ্ঞান? এবং এর উক্তি হলো স্বয়ং আল্লাহর বানী। পৃথিবীকে আমাদের রব সমতল বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তা সুস্পষ্ট।❞

দেখুনঃ https://youtu.be/_G2SikW-uQQ?feature=shared

১৫) ইমাম মুক্ববিল বিন হাদী-আল ওয়াদিঈ রহিমাহুল্লাহকে পৃথিবী কি গোলাকার নাকি সমতল? এবং এই আয়াত সম্পর্কে “এবং পৃথিবীর দিকে, কিভাবে এটিকে সমতল করা হয়েছে?” [৮৮:২০] প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে বলেন:

"আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেন। জমহুর [সংখ্যাগরিষ্ঠ] আলেমগণ বলেছেন এটা সমতল [ফ্ল্যাট], এবং আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম, এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, এবং হাফেয ইবনু কাসীর এবং তাদের একটি গ্রুপ বলেছেনঃ এটি গোলাকার, এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এমন কোন স্পষ্ট দলিল নেই যে এটি গোলাকার বা [কুরআন] এটিকে বৃত্তাকারও বলে না...............এবং এই আয়াতে এমন কিছু নেই যা এর বিপরীত বলে। আমি সর্বশক্তিমানের বাণী বলতে চাই: "এবং পৃথিবীর দিকে, কিভাবে এটিকে সমতল করা হয়েছে?"

দেখুনঃ https://youtu.be/bFFx4gpHloQ?feature=share

দেখুনঃ https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1674

১৬) weather balloon footage-

এতেও পৃথিবীর কোনো বক্রতা দেখা যায় না, এটা সমতল।

দেখুনঃ https://youtu.be/KnxvS9XFJnE?feature=shared

আরো কিছু দলীল যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী সমতল:-

১) গোলাকার পৃথিবীতে কিবলা নির্ণয় অসম্ভব।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ

❝অতএব আপনি মসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও...❞ [২:১৪৪]

কিবলামুখী হওয়া বা পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো সলাতের (নামাজের) একটি শর্ত। এবার লক্ষ্য করুন, পৃথিবী যদি সত্যিই গোল হতো তাহলে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হতো না। যারা গোল পৃথিবী মুতাবেক কাবার ঠিক বিপরীত দিকে রয়েছে তারা কখনোই কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে পারবে না, এটা অসম্ভব। তাদের মুখ কল্পিত মহাকাশের দিকে চলে যাবে। এছাড়াও আপনি যেদিকে কাবাকে সামনে করে দাঁড়ান গোল পৃথিবী মুতাবেক কাবা তখন ঠিক আপনার পিছনেও থেকে যায়। একটা বড়ধরনের অসামঞ্জস্যতা দেখা যাবে। প্রয়োজনে আপনি বাড়িতে একটা ফুটবল নিয়ে এটা পরীক্ষা করতে পারেন।

যা প্রমাণ করে পৃথিবী গোল নয়। এবার আপনি সমতলে বিষয়টা চিন্তা করুন। সমতল পৃথিবীতে এটা খুবই সহজ এবং যৌক্তিক।
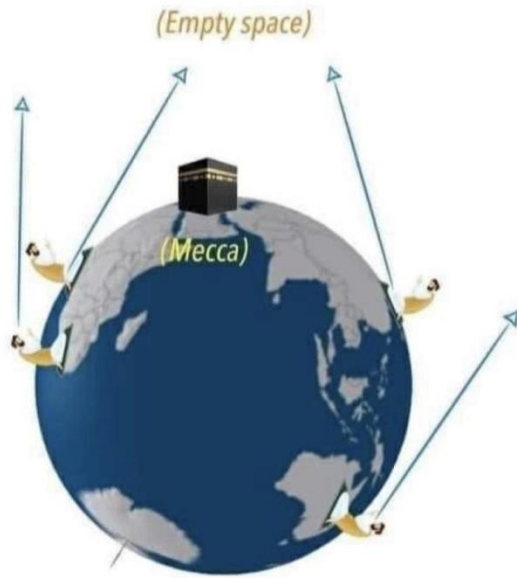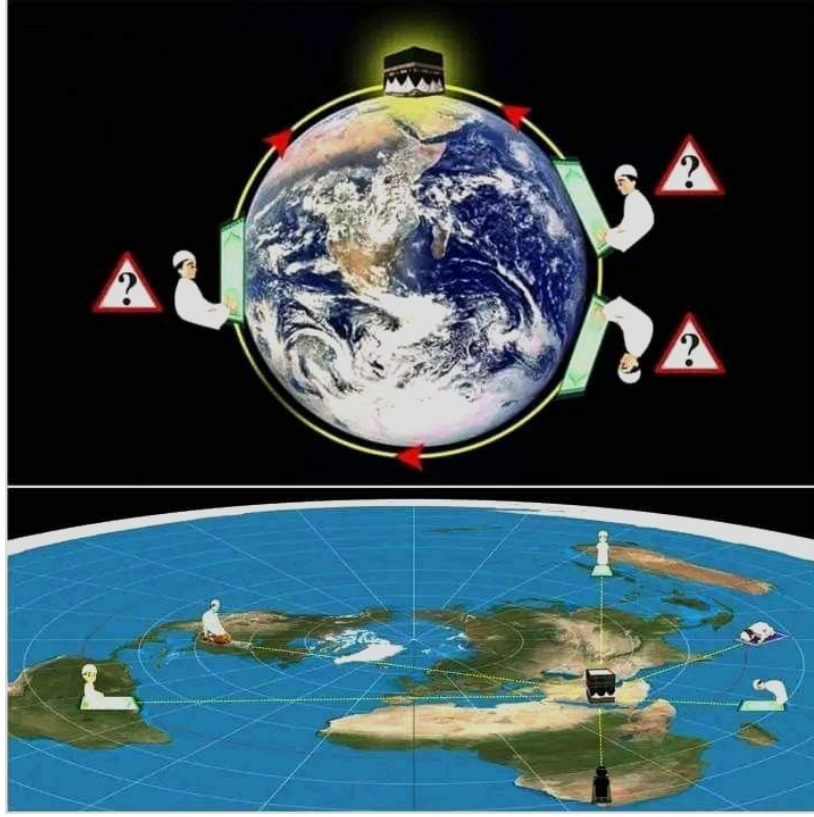
২) সমতল পৃথিবীর প্রান্তদ্বয় সম্পর্কে হাদীসে ইঙ্গিত এসেছে:

সাহল ইবনু সা’ দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ❝যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়।❞ [তিরমিযী ৮২৮,সহীহ]

উপরের হাদীসে পৃথিবীর দুই প্রান্তের কথা এসেছে। এবার গোল পৃথিবীর প্রান্ত খুঁজে বের করুন....

৩) পৃথিবীকে ঘিরে থাকা পাহাড়:

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে এবং অসংখ্য সাহাবীর ছাত্র তাবি'ঈ আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ রঃ (১১৫ হিজরী) বলেছেন যে, পাহাড় পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। পৃথিবী সমতল হলেই এটা সম্ভব।

আবু ইয়ালা <– আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ইবনু আবান <– আবু উসামা <– সালিহ ইবনে হাইয়ান <– আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ বলেন - “পান্নার একটি পাহাড় পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে, তার কাঁধে আকাশ।”

[আবু আশ-শায়খ আল ইসবাহানির রচিত কিতাব 'আযামাহ]

দেখুনঃ https://shamela.ws/book/13043/1066#pl

এই বিষয়ে সালাফদের থেকে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়:

তাফসীরে ইবনে আতিয়া (৫৪৬হি.):

ইয়াজিদ, ইকরিমা, মুজাহিদ এবং আল-দাহহাক বলেছেন: এটা হলো পৃথিবীর চারপাশের পাহাড়ের নাম, এবং এটা তাদের দাবি অনুযায়ী একটি সবুজ পান্না।

তাফসীরে কুরতুবী (৬৭১হি.):

"কাফ" এর অর্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এটা কি? ইবনে যায়েদ, ইকরিমা এবং আল-দাহহাক বলেছেন: এটি পৃথিবীর চারপাশে সবুজ পান্না দিয়ে তৈরি একটি পর্বত যা থেকে আকাশ সবুজ হয়ে গেছে এবং এর উপরে আকাশের দুই প্রান্ত রয়েছে এবং আকাশ তার উপর খিলান করা হয়েছে....।

তাফসীরে আদ-দুররুল মানসুর (৯১১হি):

মুজাহিদ রঃ থেকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ননা করেন যে, তিনি বলেনঃ "কাফ" হল পৃথিবীকে ঘিরে থাকা একটি পর্বত।

অর্থাৎ, যেভাবে দেওয়াল বাগানকে চারদিকে ঘিরে রাখে, তেমনি ক্বাফ নামের সবুজ পর্বতসারি পৃথিবীর প্রান্তভাগকে ঘিরে রেখেছে। গম্বুজাকৃতির আসমানের দুই প্রান্তভাগ এর উপরিভাগে স্পর্শ করেছে। সুতরাং এই enclosed system থেকে বের হবার পথ নেই।

মহান আল্লাহ এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সর্বোত্তম জানেন। তবে এগুলো এক একটা সমতল পৃথিবী প্রমাণের দলীল।

৪) সাইয়্যিদুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ থকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলমকে সৃষ্টি করেছেন। যা কিছু ঘটবে তা লিখে নিল। তারপর তিনি পানির বাষ্প উঠালেন। তারপর তা দিয়ে আসমান সৃষ্টি করলেন। তারপর "নূন" তথা মাছ সৃষ্টি করলেন। তারপর পৃথিবীকে সেই মাছের উপর বিস্তৃত করলেন। ফলে জমিন

কখনো নড়ে উঠে আবার স্থির হয়। তারপর সেটিকে পাহাড় দিয়ে মজবুত করলেন।

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أول ما {خلق الله من شيء القلم ، فجرى بما هو كائن ، ثم رفع بخار الماء ، يعني الحوت فخلقت منه السماوات ، ثم خلق " النون " فبسطت الأرض على ظهر النون ، فتحركت الأرض فمادت ، فأثبت بالجبال}

[তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক-২/৩০৭, ইবনে আবী শাইবা-১৪/১০১, তাফসীরে ইবনে কাসীর-৮/২১০, জামেউল বয়ান লিততাবারী-২৩/১৪০, আলমুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন-২/৫৪০, সনদ সহীহ, ইমাম হাকিম (র.) এই বিবরণটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, এটি দুই শায়খের [ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)] এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবী (র.) অনুরূপ বলেছেন।]

অনেকে এটাকে ইসরায়েলি রেওয়ায়েত বলেছেন। তবে ইসরায়েলি হলেই যে সেটা মিথ্যা, অগ্রহণযোগ্য এমনটা নয়, তার কিছু মূলনীতি রয়েছে। যদি সেটার বিপক্ষে কুরআন সুন্নাহতে কিছু না থাকে, তাহলে ইসরায়েলি বলে অস্বীকার করা যায় না।

এ বিষয়ে শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বায রঃ এর ফতোয়া দেখুনঃ

https://binbaz.org.sa/audios/1323/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%89%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA

সহীহ বুখারীতে এসছে:

·· আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল। *[বুখারী ৩৪৬১।]*

·· হযরত আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, আহলে কিতাব তাওরাত ইবরানী ভাষায় পাঠ করতো এবং মুসলমানদের জন্যে আরবী ভাষায় ওর তাফসীর করতো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তাদেরকে সত্যবাদীও বলো না, মিথ্যাবাদীও বলো না। বরং তোমরা বলো- আমাদের

প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বুদ ও তোমাদের মাবুদ তো একই এবং তারই প্রতি আমরা আত্মসমর্পণকারী।

৫) মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ এটা মশহুর ছিল যে, নূন দ্বারা ঐ মাছকে বুঝানো হয়েছে যা সপ্তম যমীনের নীচে রয়েছে।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

[সুতরাং, সপ্তম জমিনের নীচে নুনের অবস্থানও প্রমাণ করে যে পৃথিবী সমতল, এবং এটাই সাহাবীদের বিশ্বাস ছিল।]

৫) শায়খ আবু আল-মুহান্নাদ তার রিসালাহ *"হাকীকাতুল-খালক্ব"* গ্রন্থে বলেছেন:

"এবং লক্ষ্য করুন যে পৃথিবীর শারঈ বুঝ কেবলমাত্র এটি নয় যে শুধু এটিকে সমতল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, বরং এটি এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পৃথিবীর সংখ্যার বিবরণসহ আরও নিশ্চিত করা হয়েছে যে তারা একটির উপর আরেকটি এবং তাদের মধ্যকার দূরত্ব এবং এর নিচের নুন এর বর্ণনা এবং সপ্তম পৃথিবীতে অবস্থিত জাহান্নাম এবং এ সম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি এবং এগুলি সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রতিষ্ঠিত বিবরণ, যারা এবিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি। তাহলে সাহাবায়ে কেরামের বুঝের পরিপন্থী একটি বুঝ কীভাবে সঠিক হতে পারে? বরং, এই কল্পিত বুঝ খণ্ডন করার জন্য এই বিবরণগুলোর প্রতিটিই যথেষ্ট।"

(I) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৃথিবী বর্ণনা করার সময় সমতল কিছুর জন্য ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমনঃ

·· মিহাদ (বিশেষ্য) - একটি বিছানা বা সমতল জমি

·· ফিরাশ (বিশেষ্য) - একটি গদি বা বিছানা

·· দাহাহা (ক্রিয়া) - ছড়িয়ে পড়া

·· মাদ্দা (ক্রিয়া) - প্রসারিত করা

·· বাসাত্ব (ক্রিয়া) - ছড়িয়ে দেওয়া বা সমতল করা

বৃত্তাকার বস্তু বা গতি সম্পর্কে কথা বলার সময়, আল্লাহ রাত্রিকে দিনে এবং দিনকে রাত্রিতে পরিবর্তন করার জন্য কাওওয়ারা (বৃত্তাকারভাবে ঘোরানো বা সরানো) ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন এবং তিনি ফালাক (কক্ষপথ) বিশেষ্য ব্যবহার করেছেন যখন সূর্য এবং চন্দ্র তাদের নির্দিষ্ট ট্র্যাকে চারপাশে চলার বর্ণনা দেয়। তাই এটা দাবি করা সঙ্গত নয় যে আল্লাহ বারবার সমতলের বর্ণনা করে এমনকিছু শব্দ ব্যবহার করবেন যা বাস্তবে গোলাকার।

(II) নবী ﷺ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম এবং অন্যরা আকাশকে পৃথিবীর উপর একটি গম্বুজের মতো নির্মিত বলে বর্ণনা করেছেন এবং যদি পৃথিবী একটি গোলকের মতো আকৃতি হতো তবে একটি গম্বুজ পুরো পৃথিবীকে ঢেকে রাখত না।

(III) পৃথিবীকে আমরা যেভাবে জানি তার চেয়ে অনেক বড় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পাঁচশত বছরের ভ্রমণ দূরত্ব এবং অন্য কোনো বর্ণনায় প্রায় ১১৫,২০০ কিলোমিটারের সমান। কাফেরদের বক্তব্য অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি ৪০,০৭৫ কিলোমিটার। তদুপরি, বর্ণনা অনুসারে, পৃথিবীর বড় অংশগুলো জনবসতিহীন, যা আমাদের বলা হয়েছে তারও বিপরীত।

(IV) পৃথিবীর পুরুত্ব কাফেরদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী একজন ব্যক্তির সারা বিশ্বে এক রাউন্ডে হাঁটতে (বিরতি ছাড়া) প্রায় এক বছর সময় লাগবে। এটা হাদীস ও বর্ণনায় প্রদত্ত তথ্য থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া একটি গোলককে পুরুত্ব সহ বর্ণনা করা হয় না; বরং এটাকে ব্যাস দিয়ে বর্ণনা করা হয়।

(V) পৃথিবীকে প্রায়শই আকারে আকাশের সাথে তুলনা করা হয় এবং প্রস্থে এটির সমান, এবং তারা স্তরে স্তরে আঠালো ছিল (বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে), বা একত্রিত পোশাক হিসাবে;

(VI) আল্লাহ পৃথিবীকে কাবার নীচ থেকে প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যে প্রসারিত (বা বিস্তৃত) বলে বর্ণনা করেছেন, যা একটি সমতলের জন্য ব্যবহৃত শব্দ, একটি গোলকের জন্য নয়।

(VII) পৃথিবীর বাসিন্দারা এবং এর জাতিগুলো আমরা যাদের সম্পর্কে জানি তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, ইয়াজুজ এবং মাজুজ সহ এমন অনেক জাতি আছে যাদের আমরা জানিনা বা দেখিনি।...এই সবই এই

সত্যকে নির্দেশ করে যে পৃথিবী আমাদের কাছে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার থেকে অনেক বড়।

(VIII) কা'ব রাঃ এর দাবী প্রত্যাখ্যান করা (অর্থাৎ আকাশ ঘুরছে) এই সত্যের সাক্ষ্য যে, বর্ণনায় বর্ণিত তথ্যের কোনটি যদি অগ্রহণযোগ্য হয় তবে এটা এই উম্মতের আলেমগণ প্রত্যাখ্যান করতেন।

সত্য আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং আমরা এর জন্য তাঁর কাছে হেদায়েত চাই। আল্লাহুম্মা আমিন।

৬. এনক্লোজড সিস্টেম

এই অধ্যায়টি মূলত একটা কল্পনার জগতকে ভাঙ্গার জন্য লিখা। যে কল্পনার জগতে আমরা কমবেশি অনেকেই হাবুডুবু খাচ্ছি। ইল্লা মাশাআল্লাহ। আর এই কল্পনার জগৎ নিয়েই কথিত মহাকাশবিজ্ঞানীদের যত আয়োজন। সে কল্পনার জগতটি দেখতে এমন - এক অসীম মহাশূন্য, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র, আছে কল্পিত ব্ল্যাকহোল, আছে কল্পিত ছায়াপথ, আরো কতকি, এরই কোনো এক মাঝে কল্পিত ছোট্ট এই গোল পৃথিবী মহাকাশে ছুটে চলেছে সাথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেও চলেছে। নীচে এই কল্পনা জগতেরই তিনটি চিত্র-

সত্য কথা এটাই যে এই কল্পিত সৃষ্টিজগৎ আমাদের মাথায় ছোট থেকেই ঢোঁকানো শুরু হয়। একসময় এসে এটাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে মেনেনি। যার জন্যই পবিত্র কুরআন মাজীদের স্পষ্ট আয়াতগুলি আমরা বুঝতে পারিনা, এড়িয়ে চলে যায় কিংবা ভুল বুঝে থাকি। আস্তাগফিরুল্লাহ।
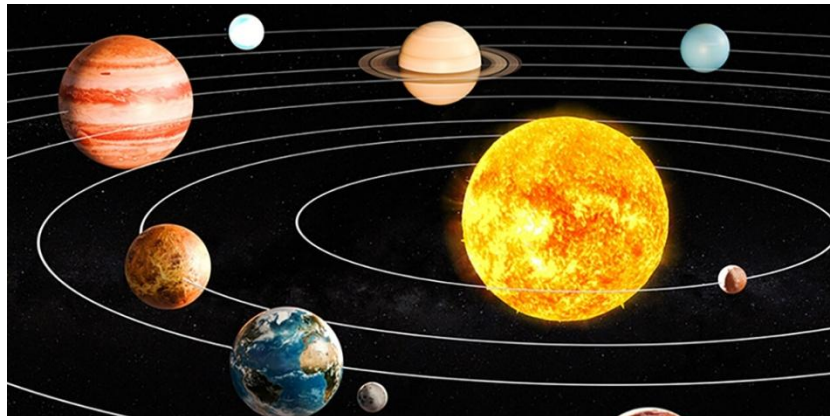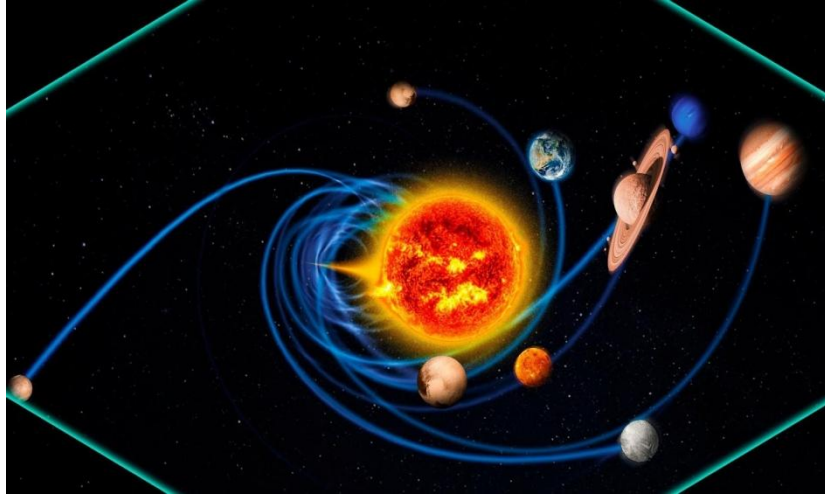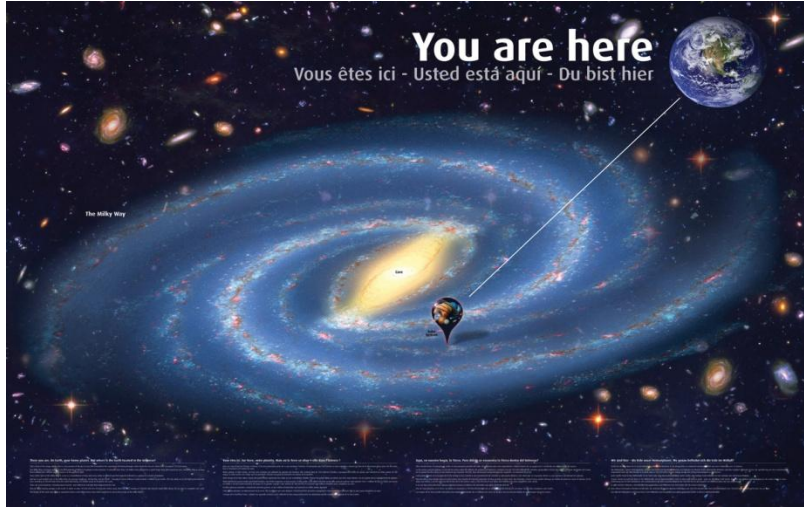
প্রত্যেকটি আয়াত বুঝে পড়ুন। মহান আল্লাহ একাধিক জায়গাতে বলেছেন।

وَ مَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ

❝আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু’ য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি❞ [১৫:৮৫]

لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا وَ مَا تَحۡتَ الثَّرٰی

❝যা আছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং এ দু’ য়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।❞ [২০:৬]

وَ مَا خَلَقۡنَا السَّمَآءَ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا لٰعِبِیۡنَ

❝আকাশ ও পৃথিবী এবং যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।❞ [২১:১৬]

اَوَ لَمۡ یَتَفَكَّرُوۡا فِیۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ ۟ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّی

❝তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেই এক নির্দিষ্ট কালের জন্য?❞ [৩০:৮]

وَ مَا خَلَقۡنَا السَّمَآءَ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا ۚ فَوَیۡلٌ لِّلَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا مِنَ النَّارِ

❝আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দু’ এর মাঝে যা আছে তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এ রকম ধারণা তো কাফিররা করে, কাজেই কাফিরদের জন্য আছে আগুনের দুর্ভোগ।❞ [৩৮:২৭]

وَ تَبٰرَكَ الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا

❝আর তিনি বরকতময়, যার কর্তৃত্বে রয়েছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু' য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু!❞ [৪৩:৮৫]

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا ۘ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّوۡقِنِیۡنَ

❝যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওগুলির মধ্যস্থিত সব কিছুর রাব্ব - যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।❞ [৪৪:৭]

وَ مَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا لٰعِبِیۡنَ

❝আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।❞ [৪৪:৩৮]

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا

❝তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু' য়ের মধ্যে যা আছে তার রব....❞ [৩৭:০৫]

আল্লাহ ﷻ তাঁর রাজত্ব জানাতে গিয়ে "আকাশ,পৃথিবী এবং এদুয়ের মাঝে {بَیۡنَهُمَا}" এই কথাটি একাধিকবার বলেছেন। পৃথিবী যদি সত্যিই মহাকাশে ভাসমান একটা বালিকণা হতো তাহলে এরূপ বলার কোনো মানে হয়না যে "আকাশ,পৃথিবী এবং এদুয়ের মাঝে {بَیۡنَهُمَا}"। আপনি উপরের আয়াতগুলি পড়ুন, আর উপরে যে তিনটি কল্পনা জগতের চিত্র দেওয়া আছে তার সাথে মিলান। দেখেন তো কিছু মিল পাচ্ছেন, নাকি দুটো পরস্পর বিরোধী সৃষ্টিতত্ত্ব মনে হচ্ছে।

জ্বি। দুটো পরস্পর বিরোধী সৃষ্টিতত্ত্ব। একটা অভিশপ্ত শয়তানের তৈরি, আরেকটি মহান আল্লাহর তৈরি, যিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর সৃষ্টি অভিশপ্ত শয়তানের অনুসারীদের তৈরি বিকৃত সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পৃথিবী মোটেও কোনো ছোট্ট গোলাকার গ্রহ নয়, এটি বিস্তৃত,প্রসারিত,বিছানো জমিন। যা আল্লাহ ﷻ সৃষ্টি করেছেন মোট চারদিনে, দুদিন আকাশ সৃষ্টির আগে আর দুদিন আকাশ সৃষ্টির পরে। যা আপনারা "পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা" অধ্যায়ে বিস্তারিত জেনেছেন।

আপনি কি মনে করেন, কুফফারদের দেওয়া ছোট্ট এই পৃথিবী চারদিনে সৃষ্টি করা হয়েছে!?

আবার এর উপরে রয়েছে দৃঢ় আসমান। ওরা তো সলিড আসমানকেই অস্বীকার করেছে।

নীচের আয়াতটি দেখুন, আল্লাহ ﷻ খুবই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, অথচ আমরা অনেকেই ভাবিনা আয়াতগুলি নিয়ে।

মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَہُمَا فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ

❝তিনি আসমানসমূহ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠলেন।❞ [২৫:৫৯]

আয়াতটি লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ আকাশ পৃথিবী ও এই দুয়ের মাঝের সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন - এইটা স্পষ্টভাবেই প্রচলিত গ্লোব পৃথিবীর অস্তিত্বকে নাকচ করেছে। এই আয়াত উপরে বিশাল আসমান ও নীচে বিশাল জমিনের অস্তিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করছে। এখানে কল্পবিজ্ঞানীদের কথিত "আউটার স্পেস" নামক কল্পনার জগতকে নাকচ করা হয়েছে। বস্তুত এই আয়াত থেকেও প্রমাণ হয় পৃথিবী কল্পিত মহাকাশে ভাসমান কোনো ছোট্ট গ্রহ নয়, এটা মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি। এর ওপর রয়েছে গম্বুজাকৃতির আকাশ। এবং এই দুয়ের মাঝের অংশটাই সত্যিকারের স্পেস, যেটা মোটেও বায়ুশূন্য নয়। কারণ নুহ আঃ এর কওমের ওপর এই আসমান থেকেই বৃষ্টি নাযিল হয়েছিল। এই আকাশ জমিনের মাঝের স্পেস এবং মেনস্ট্রিম কথিত মহাকাশবিজ্ঞানীদের দেখানো স্পেসের মধ্যে রয়েছে বিরা...ট পার্থক্য।

মহান আল্লাহর এই বাণী,

❝ তিনি আসমানসমূহ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; ❞

আয়াতে {بَيْنَهُمَا} শব্দের অর্থ "এদুয়ের মাঝে"। সুতরাং, আকাশ ও পৃথিবী - এইদুই সৃষ্টি মিলে বানিয়েছে একটা এনক্লোজড সিস্টেম। এটাই প্রকৃত সৃষ্টিজগত।

ওয়াল্লাহু আ'লাম।

প্রচলিত সৌরজগতকে প্রত্যাখ্যান:-

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের প্রবীণ সদস্য, যুগশ্রেষ্ঠ ফাকিহ আশ-শাইখুল আল্লামা ইমাম সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ [জন্ম: ১৩৫৪ হিজরী/ ১৯৩৫ ঈসায়ী] বলেন:

"আল্লাহ আকাশের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য আয়াতে তিনি তারকাদের উল্লেখ করেছেন। এরা আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল্লার সৃষ্টি: পৃথিবী, আকাশ, তারা, সূর্য ও চন্দ্র। এই সময়ে, অজ্ঞতার অনুসারী এবং প্রকৃতির অনুসারী, তাদের জন্য কোন নির্মিত আকাশ নেই এবং তারা এটি স্বীকার করে না। তারা বলে একটি সৌরজগৎ আছে। সূর্য কেন্দ্রে আছে এবং আকাশের বস্তুগুলি সূর্যের চারদিকে ঘোরে, নক্ষত্রগুলি সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এটি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক! সূর্য একটি আকাশস্থ বস্তু যা তার কক্ষপথে ঘোরে, তারা পৃথিবীর উপরে তাদের কক্ষপথে ঘোরে। এগুলো পৃথিবীর ওপরে ঘোরে এবং পৃথিবীই কেন্দ্র। আল্লাহ পৃথিবী, আকাশ ও নক্ষত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। সবকিছুরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি পবিত্র কোরআনে পাওয়া যায়। এগুলো সৃষ্টিকর্তার বাণী যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র ও মহিমান্বিত। এই দুটির মধ্যে কোনটি সত্য বলছে: অজ্ঞ নাস্তিক নাকি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বাণী, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে শুদ্ধ ও মহিমান্বিত, সত্য বলছেন - "এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?" (৮৮:২০)

দেখুনঃ https://youtu.be/7T45mInXIM0?feature=shared

৭. চন্দ্র ও সূর্য

কথিত মহাকাশবিজ্ঞানের অকল্যাণে চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে একাধিক ভুল বিলিভস্ আমাদের মাথায় গেঁথে রয়েছে। ইল্লা মাশাআল্লাহ।

তারা বলে কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি হলো এই সূর্য, আর তাকে কেন্দ্র করেই কথিত গ্রহগুলি ঘুরে চলেছে। এইখানেই থামেনি তারা, সাথে এটাও বলছে যে সূর্যসহ কথিত গ্রহগুলো সবই যেনো কল্পিত মহাকাশে ছুটে চলেছে। একের পর এক মিথ্যাচার দিতেই আছে। আর তাঁরা সুকৌশলে কল্পনা ও মিথ্যাচার মিশ্রিত এই শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই অধ্যায়ে চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে দীন ইসলাম কি শিক্ষা দেয় সেটাই আলোচনা হবে। সাথে ধরতে পারবেন কল্পিত মহাকাশ বিজ্ঞানের মিথ্যাচারগুলিও।

চাঁদ ও সূর্য দুটি নিদর্শন ও সময় নিরূপক:-

আল্লাহ ﷻ চাঁদ ও সূর্যকে দুটি নিদর্শন ও সময়ের হিসাব রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

১) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ مِنۡ اٰیٰتِهِ الَّیۡلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمۡسُ وَ الۡقَمَرُ ؕ

❝আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ❞ [৪১:৩৭]

২) মহান আল্লাহ অন্যত্রে বলেন:

فَالِقُ الۡاِصۡبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّیۡلَ سَکَنًا وَّ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ حُسۡبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقۡدِیۡرُ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ

❝(তিনি) প্রভাত উদ্ভাসক। তিনি বানিয়েছেন রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক। এটা সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারণ।❞ [৬:৯৬]

৩) মহান আল্লাহ অন্যত্রে বলেন:

یَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الۡاَهِلَّۃِ ؕ قُلۡ هِیَ مَوَاقِیۡتُ لِلنَّاسِ وَ الۡحَجِّ

❝তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, ‘তা মানুষের ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক’ ।❞ [২:১৮৯]

চাঁদ ও সূর্যের মনযিলসমূহ (কক্ষপথ):-

১) মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ الشَّمۡسَ ضِيَآءً وَّ الۡقَمَرَ نُوۡرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِيۡنَ وَ الۡحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالۡحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ

❝তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।❞ [১০:৫]

তাফসীরে আহসানুল বায়ান:

আমি চন্দ্র পরিভ্রমণের কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি। কক্ষপথ (মনযিল) বলতে তার ঐ পরিভ্রমণপথকে বুঝায়, যা চাঁদ এক দিন ও এক রাত্রে তার বিশেষ পরিক্রমণ দ্বারা অতিক্রম করে। উক্ত কক্ষ হল ২৮টি। প্রত্যেক রাত্রে একটি কক্ষ সমাপ্ত করে, তাতে কখনো কোন ব্যতিক্রম হয় না। প্রথম কক্ষগুলিতে চাঁদকে ছোট ও সরু দেখা যায়। তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এমন কি চৌদ্দ রাত্রি বা চৌদ্দতম কক্ষে গিয়ে তা পূর্ণ (পূর্ণিমার) চন্দ্র রূপে প্রকাশ হয়। তারপর পুনরায় ছোট ও সরু হতে আরম্ভ করে, এমনকি শেষে এক বা দুই রাত্রি লুক্কায়িত থাকে এবং পরে প্রথম দিনের ক্ষীণচন্দ্র রূপে উদিত হয়। চন্দ্রের উপকারিতা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, "যাতে তোমরা বছরের গণনা ও সময়ের হিসাব করতে পার।" অর্থাৎ চন্দ্রের সেই কক্ষপথ ও গতি দ্বারাই মাস ও বছর গণনা হয়, যার দ্বারা তোমাদের সকল বস্তুর হিসাব রাখা সহজ হয়।

২) মহান আল্লাহ অন্যত্রে বলেন:

وَ الۡقَمَرَ قَدَّرۡنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالۡعُرۡجُوۡنِ الۡقَدِيۡمِ

❝আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়।❞ [৩৬:৩৯]

তাফসীরে ফাতহুল মাজিদ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অবশেষে চাঁদ পুরাতন খেজুর মোসার ডাটার মতো রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ যখন শেষ কক্ষপথে পৌঁছে যায় তখন একেবারে সরু হয়ে যায়; যেমন খেজুরের পুরাতন মোচার ডাটা, যা শুকিয়ে বাঁকা হয়ে যায়।

ছবিতে দেখুনঃ

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ প্রমুখ পূর্বযুগীয় গুরুজন বলেন যে, এ ফালাক (কক্ষপথ) হচ্ছে চরখার ফালাকের মত। মুজাহিদ রঃ বলেন যে, এটা যাতার পাটের লোহার মত।
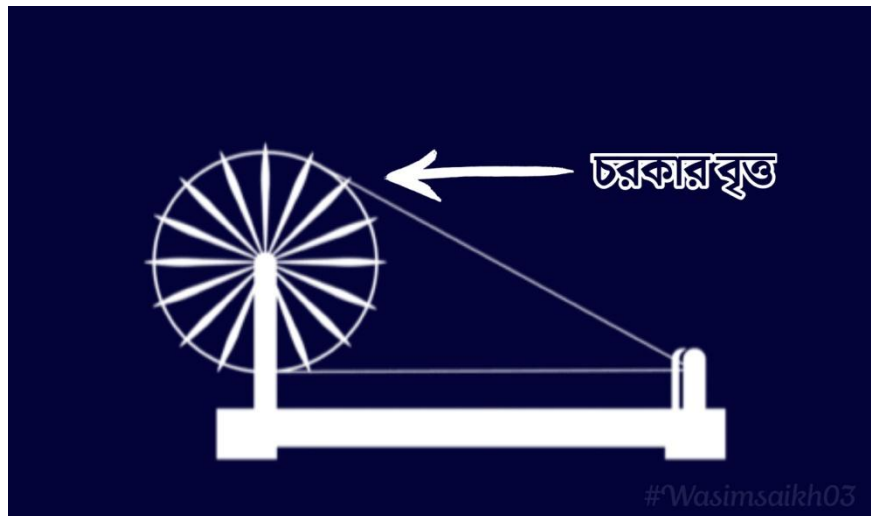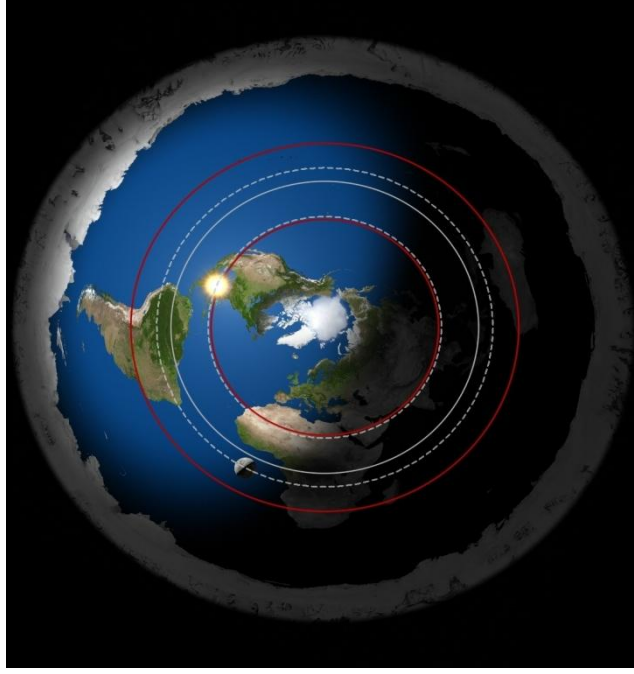
৩) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ فِیۡ فَلَكٍ یَّسۡبَحُوۡنَ

❝আর আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।❞ [২১:৩৩]

তাফসীরে জাকারিয়া:

প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فلك বলা হয়। এ কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে

فلكة المغزل

বলা হয়। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] ...... এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। "সবাই এক একটি ফালাকে (কক্ষপথে) সাঁতরে বেড়াচ্ছে" –এ থেকে দুটি কথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। এক, প্রত্যেকের ফালাক বা কক্ষপথ আলাদা। দুই, ফালাক এমন কোন জিনিস নয় যেখানে এ গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খুঁটির মতো প্রোথিত আছে এবং তারা নিজেরাই এ খুঁটি নিয়ে ঘুরছে। বরং তারা কোন প্রবাহমান অথবা আকাশ ও মহাশূন্য ধরনের কোন বস্তু, যার মধ্যে এই গ্রহ-নক্ষত্রের চলা ও গতিশীলতা সাঁতার কাটার সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

* ইবন আব্বাস রাঃ বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে। *[ফতোয়া আরকানুল ইসলাম]*

* মুজাহিদ রঃ বলেন, উভয়ের(অর্থাৎ চাঁদ ও সূর্যের) আবর্তন চাকার আবর্তনের অনুরূপ। আর অন্যেরা বলেন, উভয় এমন এক নির্দিষ্ট হিসাব ও স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা তারা অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য লংঘন করতে পারে না।

[সহীহ বুখারী ৩১৯৯]

৪) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِ

❝শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আসমানের।❞ [৮৫:০১]

তাফসীরে জাকারিয়া:

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে বুরুজ {بُرُوجٌ} এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। তবে ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারীর মত হচ্ছে, এখানে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানস্থলসমূহ। আর তার সংখ্যা বারটি। সূর্য তার প্রতিটিতে একমাস চলে। আর চন্দ্র এর প্রতিটিতে দুইদিন ও একদিনের তিনভাগের এক অংশ সময় চলে। এতে করে চাঁদের আটাশটি (২৮টি) অবস্থান হয়। তারপর সে দুদিন গোপন থাকে। এই বারটির প্রত্যেকটি একেকটি বুরুজ {بُرْجٌ}। চন্দ্র ও সূর্য আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব বুরুজ {بُرُجٌ} এর মধ্যে অবতরণ করে। [ইবন কাসীর]

সুতরাং, জানা গেলো পৃথিবীর ওপর সূর্য ও চন্দ্র দুটোই নিজ নিজ কক্ষপথে গতিশীল রয়েছে।

চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে:-

কল্পবিজ্ঞানীদের আরেক মিথ্যাচার এটা যে চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। চাঁদ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে যার জন্য আমরা চাঁদকে আলোময় দেখি।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَ خَسَفَ الۡقَمَرُ

❝এবং চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন।❞ [৭৫:৮]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

মহান আল্লাহর বাণী- চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ দুটোকেই জ্যোতিহীন করে জড়িয়ে নেয়া হবে।

জ্যোতির্ময় চন্দ্রকে কিয়ামতের দিন জ্যোতিহীন করা হবে, চাঁদের যদি নিজস্ব আলো নাই থাকে, সেটাকে আলোকহীন করবার কথা বলার কোন মানে হয় না। এটা প্রমান করে চাঁদের নিজস্ব আলো আছে।

(বি. দ্রঃ ইমাম ইবনে কাসির রঃ এখানে চাঁদের নিজস্ব আলোর কথা ইঙ্গিত করলেও অন্যত্র চাঁদের আলোকে সূর্য থেকে আগত বলেছেন। দুরকমের কথা উল্লেখের প্রকৃত কারন এক আল্লাহই ভাল জানেন। তবে তার সমসাময়িক সময়ে গ্রীক পিথারোরিয়ান/টলেমিয়ান এ্যাস্ট্রোনমির প্রসিদ্ধি আর প্রভাব চারদিকে ছড়াচ্ছিল। এটা তিনি তার কিতাবাদিতে একাধিকবার উল্লেখ করেন। মাঝেমধ্যে এস্ট্রোনমারদের আকিদা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা খন্ডনও করেছেন। এরূপ হতে পারে তিনি কিছু কিছু বিষয় গ্রীক এস্ট্রোনমি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। হতে পারে চাঁদের আলোর প্রশ্নে ওইরূপ কিছু হয়েছে। ওয়াল্লাহু আলাম।)

চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে এটা প্রমাণের জন্য আমি বেশি দলীল আনার প্রয়োজন মনে করছিনা। কারণ চাঁদের আলো বুঝাতে পবিত্র কুরআনে যে শব্দ দুটো এসেছে, সেগুলোই সবচেয়ে বড়ো দলীল।

মহান আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ الشَّمۡسَ ضِيَآءً وَّ الۡقَمَرَ نُوۡرًا

❝ তিনিই সূর্যকে দীপ্তিময় ও চাঁদকে আলোকময় করেছেন... ❞ [১০:০৫]

তিনি অন্যত্রে বলেন:

تَبٰرَكَ الَّذِىۡ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوۡجًا وَّ جَعَلَ فِيۡهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيۡرًا

❝ কত বরকতময় তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন বিশাল তারকাপুঞ্জ এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ। ❞ [২৫:৬১]

চাঁদের আলো বোঝাতে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দুটো শব্দ বলেছেন:

* 'নূর' {نُور} অর্থাৎ আলো।

* 'মুনির' {مُنِير} অর্থাৎ উজ্জ্বল/আলোকিত।

এই দুটো শব্দেরই অর্থ নিজস্ব আলো। আজ যারা কাফিরদের কল্পবিজ্ঞানের মোহে পরে পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত শব্দ 'নূর', 'মুনীর' এর অপব্যাখ্যা করে বলছে এর অর্থ "ধার করা আলো", এরা জানতে কিংবা অজান্তে সুস্পষ্ট মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। আরবি অভিধানে নূর অর্থ আলো বা জ্যোতি।

* এবিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, আশ-শাইখুল ইসলাম, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ [মৃত: ৭২৮ হিজরী] রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

❝দিয়া, নূর ইত্যাদি শব্দগুলি এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা নিজে থেকেই আলো তৈরি করে, যেমন সূর্য, চাঁদ এবং আগুন।❞

[আল-জওয়াব আস-সহীহ ৪/৩৬৮]

* ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রঃ বলেন:

এই চন্দ্র হলো বিশাল আকৃতির সৃষ্টি। এটি কালো বর্ণের গোলাকার জ্যোতিষ্ক। প্রথম দিকে এর আলোক রেখা চিকন থাকে। এরপর

প্রতিরাতে একটু একটু বাড়তে থাকে এই আলো। একসময় পরিপূর্ণ আলো প্রকাশ পায়। তখন অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুন্দর অবয়বে আত্মপ্রকাশ করে। অতপর পুনরায় তার আলো হ্রাস পেতে পেতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে চন্দ্রের মাধ্যমে মাস ও বছরের হিসাব গণনা করা যায়। *[তিবয়ান ফি আকসামিল কোরআন]*

সুতরাং, চাঁদের আলো সূর্যের থেকে ধার করা - এই তথ্য হলো কল্পবিজ্ঞানীদের মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ চাঁদের আলোকে নুর শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ নিজস্ব আলো, মোটেই ধার করা নয়। মহান আল্লাহর ৯৯ টি সুন্দর নামের মধ্যে একটি নাম "আন নুর" {النور}। অতএব এই "নুর" শব্দকে ধার করা আলো বলা একটি ভুল ছাড়া কিছুই নয়।
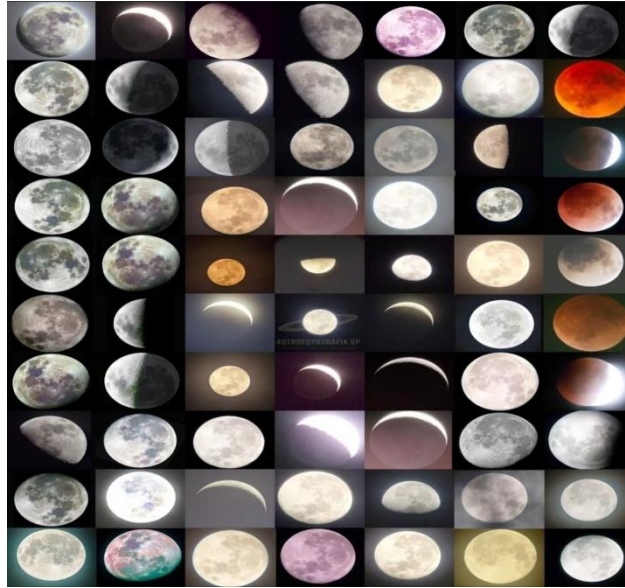
সূর্য কি কোনো নক্ষত্র:-

১) মহান আল্লাহ বলেন:

❝আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তারই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন।❞ [৭:৫৪]

সুতরাং, এটাও স্পষ্ট যে সূর্য কোনো নক্ষত্র বা তারকা নয়। তারকা ও সূর্য দুটোই আলাদা সৃষ্টি। তারকা সম্পর্কে "গম্বুজাকৃতি আসমান" অধ্যায়ে আলোচনা হবে।

আর সূর্য মোটেও আগুনের জ্বলন্ত গোলা নয় যেমনটা অপবিজ্ঞানীরা বলে। দেখুনঃ https://youtu.be/Sdo5uqSQem4?feature=shared

সূর্য কি পৃথিবীর থেকে বড়ো:-

কল্পবিজ্ঞান বলে সূর্য নাকি পৃথিবীর থেকেও ১৩ লক্ষ গুণ বড় আকৃতিরবিশিষ্ট। অথচ আমরা সামান্য মেঘের টুকরোতেও সূর্যকে আড়াল হয়ে যেতে দেখি। এটা বাস্তবতাবিরোধী। তারপরে সূর্য তো একটা প্রদীপ আর পৃথিবী বাসস্থান। তাহলে কি তারা বলতে চায় ঘরের থেকে প্রদীপটাই বড়ো!?

১) যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, আশ-শাইখুল ইসলাম, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ [মৃত: ৭২৮ হিজরী] রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

"আকাশ ও পৃথিবী সূর্য, চন্দ্র, রাত ও দিনের চেয়ে বড়।"

[মাজমু' আল-ফাতাওয়া ১৬/২৩০]

২) যুগশ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ শাইখুল ইসলাম ইমাম 'আব্দুল 'আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ১৪২০ হি./১৯৯৯ ঈসায়ী] বলেছেন:

"যেমন কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দাবি যে সূর্য আকাশের চেয়ে বড়, পৃথিবীর চেয়েও বড়, ইত্যাদি; এটি একটি অবাস্তব দাবি, আমরা এর বৈধতা জানি না, এবং আমরা এর দলিল জানি না; এটি একটি মহান নিদর্শন। এটি [সূর্য] যে আকাশ ও পৃথিবীর চেয়েও বড়, এমন একটি বিষয় যার জন্য দলিল দরকার। এটি কেবল একটি দাবি, যেমনটি

আলেমরা বলেছেন। এগুলো কেবল দাবি, যতদূর আমরা জানি তাদের পক্ষে কোনও স্পষ্ট দলিল নেই।”

দেখুনঃ
https://www.facebook.com/share/v/ooyusVHZoNacjRYF/?mibextid=oFDknk

সূর্য ঘোরে নাকি পৃথিবী:-

এখন তো কল্পবিজ্ঞানীরাও সূর্যের গতির কথা বলছে। কিন্তু কিছু মিথ্যাচারের সাথে। তারা বলে সূর্য তার কল্পিত সৌরপরিবার অর্থাৎ পৃথিবীসহ বাকি কল্পিতগ্রহ গুলোকে নিয়ে মহাকাশে ছুটে চলেছে। আর পৃথিবীসহ বাকি গ্রহগুলো মহাকাশে ছুটার সাথে সাথে সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এটা গোটাটাই তাদের মিথ্যাচার।

প্রথমত, পৃথিবী সমতল। তাই এমনটা মোটেও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবী ঘোরে না, এটি স্থির। একাধিক দলীল এর পক্ষে রয়েছে যেটা আগেই উল্লেখ করেছি। মনে না থাকলে "পৃথিবী স্থির" অধ্যায়টি আবার পড়ে আসুন। তৃতীয়ত, তারা যে মহাশূন্যের কথা বলে বেড়ায় সেটার অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্ব আছে তবে কল্পনার জগতে, বাস্তবে নয়। তাই সূর্য মহাকাশে ছুটছে এরকম দাবী করাটা স্পষ্ট মিথ্যাচার।

চতুর্থত, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে না বরং সূর্যই এই সমতল পৃথিবীর ওপর ঘূর্ণয়মান।

এই বিষয়ে কিছু ফতোয়া এবং ভিডিও ফুটেজ নীচে দেওয়া হলো:

১) বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ফাকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসুলবিদ আশ-শাইখুল 'আল্লামাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহর [মৃত: ১৪২০হিজরী] বলেন–

প্রশ্নকারী: সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, এটা কি কুরআন অনুযায়ী?

শায়খ: কুরআনে এটাই আছে। পৃথিবী হল সেই কেন্দ্রস্থল যার চারপাশে সূর্য প্রদক্ষিণ করে...এবং এর প্রমাণ হল মহান আল্লাহর বাণী: "আর আপনি দেখতে পেতেন সূর্য উদয়ের সময় তাদের গুহার ডান পাশে হেলে যায় এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে," (১৮:১৭)

তাই এখানে আল্লাহ সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার কাজকে দায়ী করেছেন। তিনি এটিকে ঝুঁকে পড়া এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কাজটিকেও দায়ী করেছেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ বলেন: "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।" (৩৬:৩৮)

অতএব, কুরআন থেকে যা স্পষ্ট যে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে...এবং ফলস্বরূপ এই আপাত প্রমাণ গ্রহণ করা আমাদের উপর বাধ্যতামূলক...এবং আমরা বলি পৃথিবী হলো কেন্দ্রস্থল.. আর সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে... এবং চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং নক্ষত্রগুলিও পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এমনকি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নবী আবু যরকে বলেছিলেন:"তুমি কি জানো কোথায় যাচ্ছে? তিনি (আবু যার) বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।" তাই তিনি (নবী) বললেন: "নিশ্চয়ই এটি আরশের কাছে সিজদা করবে এবং অনুমতি চাইবে (চলতে থাকবে).....এবং যদি এটিকে অনুমতি না দেওয়া হয় তবে এটি যে দিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যাবে। এটা পরিষ্কার।

দেখুনঃ https://youtu.be/4rJI7S6nHiA?feature=shared

২) আশ-শাইখুল আল্লামা ইমাম সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ [জন্ম: ১৩৫৪ হিজরী] প্রদত্ত ফতোয়া–

আল্লাহ আকাশের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য আয়াতে তিনি তারকাদের উল্লেখ করেছেন। এরা আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল্লার সৃষ্টি: পৃথিবী, আকাশ, তারা, সূর্য ও চন্দ্র। এই সময়ে, অজ্ঞতার অনুসারী এবং প্রকৃতির অনুসারী, তাদের জন্য কোন নির্মিত আকাশ নেই এবং তারা এটি স্বীকার করে না। তারা বলে একটি সৌরজগৎ আছে। সূর্য কেন্দ্রে আছে এবং আকাশের বস্তুগুলি সূর্যের চারদিকে ঘোরে, নক্ষত্রগুলি সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এটি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক! সূর্য একটি আকাশস্থ বস্তু যা তার কক্ষপথে ঘোরে, তারা পৃথিবীর উপরে তাদের কক্ষপথে ঘোরে। এগুলো পৃথিবীর ওপরে ঘোরে এবং পৃথিবীই কেন্দ্র। আল্লাহ পৃথিবী, আকাশ ও নক্ষত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। সবকিছুরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি পবিত্র কোরআনে পাওয়া যায়। এগুলো সৃষ্টিকর্তার বাণী যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র ও মহিমান্বিত। এই দুটির মধ্যে কোনটি সত্য বলছে: অজ্ঞ নাস্তিক নাকি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বাণী, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে শুদ্ধ ও মহিমান্বিত, সত্য বলছেন - "এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?” (৮৮:২০)

দেখুনঃ https://youtu.be/7T45mInXIM0?feature=shared

৩) শায়খ অন্যত্রে বলেন:

"আমাদের বা মুমিনদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, যেমনভাবে তারা (নক্ষত্র) এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তু (আফলাক) প্রদক্ষিণ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত।"

দেখুনঃ https://youtu.be/NH_NQisXTRE?feature=shared

৪) এমনকি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ। তিনিও এটা বলেছিলেন। তিনি বলেন:

❝...এবং একইভাবে যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের সময়, আকাশের মাঝখানে এবং অস্ত যাওয়ার সময়, তিনবার, একই দূরত্বে এবং সূর্যের অবস্থা

দেখে। একইভাবে, পৃথিবীর পৃষ্ঠের মধ্যে থেকে, তারা জানে যে এটি (অর্থাৎ সূর্য) একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রবাহিত হয় ... ❞

[মাজমু আল ফাতাওয়া ৬/৫৮৯]

৫) সূর্য কল্পিত মহাকাশে নাকি সমতল পৃথিবীর ওপরে ঘূর্ণয়মান জানতে দেখুনঃ https://youtu.be/u_ubSEAcf2c?feature=shared

সুতরাং, সূর্য এবং চাঁদ এইদুটি সমতল পৃথিবীর ওপর ঘূর্ণয়মান। যেমনটা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ❝লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে।❞

[ফতোয়া আরকানুল ইসলাম]

তবে কোনো কোনো হাদীসে সূর্যের ফিজিক্যালি অস্ত যাওয়ার বিষয়টিও এসেছে। যেমন:

৭) আবূ যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একটি গাধার ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তার উপর একটি পাড়যুক্ত চাদর ছিল। তিনি বলেন: এটা ছিল সূর্যাস্তের সময়, তিনি আমাকে বলেন: “হে আবূ যর তুমি জান এটা কোথায় অস্ত যায়?” তিনি বলেন: আমি বললাম: আল্লাহ এবং তার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলেন: সূর্যাস্ত যায় একটি কর্দমাক্ত ঝর্ণায়, সে চলতে থাকে অবশেষে আরশের নিচে তার রবের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়ে, যখন বের হওয়ার সময় আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন, ফলে সে বের হয় ও উদিত হয়। তিনি যখন তাকে যেখানে অস্ত গিয়েছে সেখান থেকে উদিত করার ইচ্ছা করবেন আটকে দিবেন, সে বলবে: হে আমার রব আমার পথ তো দীর্ঘ, আল্লাহ বলবেন: যেখান থেকে ডুবেছে সেখান থেকেই উদিত হও, এটাই সে সময় যখন ব্যক্তিকে তার ঈমান উপকার করবে না” । [আহমদ] হাদিসটি সহিহ। *[হাদীসে কুদসী ১৬১]*

৮) আবূ যার রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর পিছনে একই গাধার পিঠে বসা ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল তিনি

আমাকে বললেনঃ তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেনঃ

فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ

❝এটা উষ্ণ পানির এক ঝর্ণায় অস্তমিত হয়' ❞ (সূরা কাহফঃ ৮৬)। *[আবূ দাঊদ ৪০০২]*

[আহমাদ, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেনঃ সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।]

৯) আবূ যার রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একটি গাধার পেছনে সওয়ার ছিলাম। এ সময় সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি জান, সূর্য কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বলি, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে অধিক অবহিত। তিনি বলেন

عَيْنٍ حَامِيَةٍ

এটি অর্থাৎ গরম প্রসবণের মধ্যে যায়।

[আবূ দাঊদ ৩৯৬১, সহীহ]

১০) সহীহ বিশুদ্ধ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, ❝সূর্য চরকার মত, দিনের বেলায় আকাশে আপন কক্ষপথে চলে, অতঃপর যখন অস্তমিত হয়, তখন রাতের বেলায় পৃথিবীর নিচে (অপর প্রান্তে) আপন কক্ষপথে চলতে থাকে এবং পুনরায় পূর্ব থেকে উদিত হয়। চাঁদের ব্যাপারও অনুরূপ।❞ *[ইবনে কাসীর]*

সূর্যের এই ফিজিক্যালি অস্ত যাওয়ার বিষয়টি মেনস্ট্রিম কল্পিত মহাকাশবিজ্ঞানের সম্পূর্ন বিপরীত।

যমীনের এক প্রান্তে অস্তগমনের পর সিজদা, অনুমতি প্রার্থনা এবং অপর প্রান্তে পৌছে উদিত হতে সূর্য এত অল্প সময় ব্যয় করে যে, কখনো এমন হয় না যে যমীনের একদিকে সূর্যাস্তের পর অপর দিকে সূর্যোদয়ে বিলম্ব হয় বা অন্ধকার হয়ে থাকে। যে আল্লাহ মিরাজের রাতে নবী ﷺ-কে সশরীরে সাত আসমান ভ্রমন করিয়ে আনেন কোনরূপ সময়

ব্যয় ছাড়াই, তাঁর পক্ষে বিনা কালক্ষেপনে বা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সূর্যকে যমীনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কোন কিছু না বুঝে আসার মানে এই নয় যে ওটা ঐরূপ নয়। কুরআন সুন্নাহর ব্যাপারে আমাদের উচিৎ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে "শুনলাম এবং মানলাম"। সূর্যের এই অস্ত যাওয়ার বিষয়টিও যেহেতু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাই আমরা নিঃসন্দেহে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি সেটা সেইভাবেই হয় যেমনভাবে হাদীসে এসেছে। আল্লাহু আ'লাম।

[উল্লেখ্য যে: মেনস্ট্রিম ফ্ল্যাট আর্থ মডেলকে আমরা ততটাই বিশ্বাস করি যতটা কুরআন সুন্নাহর সাথে মিল খায়। প্রচলিত ফ্লাট আর্থারদের মতে সূর্য কখনো অস্ত যায়না, কিন্তু হাদীসে আছে সূর্যের ফিজিক্যালি অস্তের কথা। তাই আমরা হাদীসের দিকে ফিরে গিয়েছি।]

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ :-

রাসুল ﷺ বলেছেনঃ কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহন বা চন্দ্রগ্রহন হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সলাত আদায় করবে। *[বুখারী ৯৮৪]*

১) আকাশে যখন চাঁদ ও সূর্য নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে, তখন কোনো কোনো সময় চাঁদ সূর্যের সামনে এমনভাবে চলে আসে যে সূর্য ঢেকে যায়। এটাই সূর্যগ্রহণ। এর জন্য পৃথিবীকে গোলাকার হবার দরকার পড়ে না।

সমতল পৃথিবীর ওপর সূর্য চাঁদের চলাচল বুঝতে ভিডিওটি দেখুন। ভিডিওর শেষ অংশে সূর্যগ্রহণ এর বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

দেখুনঃ https://youtu.be/a3Pv-6PAtc8?feature=shared

২) আর চাঁদের মাঝে যাবতীয় ক্ষমতা রয়েছে আলো নির্গত করার, পূর্ণিমা,অমাবস্যা, চন্দ্রগ্রহণ, রেড মুন, ব্লু মুন ইত্যাদি নিদর্শন সংগঠিত করার। ইহা মহান আল্লাহর কর্তৃত্বের একটি নিদর্শন। আল্লাহু আ'লাম।

তারা যে বলে পৃথিবীর ছায়ার জন্য চন্দ্রগ্রহণ হয়, ওটা ডাহা মিথ্যা কথা। চন্দ্রগ্রহণ কেউ যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

দেখুনঃ https://youtu.be/hUqBlMdsHZs?feature=shared

প্রশ্ন: জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে আগাম সংবাদ দেয় কিভাবে?

জবাব: এটা নতুন কোন বিষয় নয়। ঈসায়ীপূর্ব আমলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন হিসাব নিকাশ করে এ সম্পর্কে আগাম তথ্য বলতে পারত। এক্ষেত্রে একটি নামকরা যন্ত্র হলো অ্যাস্ট্রোলেব।

এছাড়াও, অন্যান্য কারণও থাকতে পারে, এগুলো জ্যোতিষী-জ্যোতির্বিদদের শাস্ত্রে রয়েছে। আর এটা এমন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় নয় যে আমরাকে এখন গ্রহণের ভবিষ্যৎবাণী করা শিখতে হবে। এগুলো অহেতুক বিষয়। গ্রহণ লাগলে শরীয়তে যা আদেশ এসছে সেগুলো পালন করতে হবে।

আমরা আমাদের স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতেই বিশ্বাস রাখি। সেই দলিলগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে এখন কেউ যদি শুধুমাত্র গ্রহণ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গোলাকার পৃথিবী দাবি করে তাহলে তার ব্যাপারে কিছু বলার নেই।

আমরা তো ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমেও তাদের হেলিওসেন্ট্রিজম মিথ্যা প্রমাণ করেছি। দেখুনঃ

(i) https://youtu.be/NNr-Y1AOrqc?feature=shared
(ii) https://youtu.be/Cja4DQg1lhQ?feature=shared

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত:-

১) মহান আল্লাহ বলেন,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا وَ رَبُّ الۡمَشَارِقِ

❝তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু’ য়ের মধ্যে যা আছে তার রব এবং রব উদয়স্থলসমূহের।❞ [৩৭:৫]

তাফসীরে জাকারিয়া:

সুদ্দী রঃ বলেন, এর বহু বচনের কারণ হচ্ছে, শীতকাল এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য উদিত হওয়ার স্থানের ভিন্নতা। তিনি আরও বলেন, সারা বছরে সূর্যের ৩৬০টি উদিত হওয়ার স্থান রয়েছে, অনুরূপভাবে সূর্যস্ত যাওয়ারও অনুরূপ স্থান রয়েছে। *[তাবারী]*

২) আরেক জায়গায় এসছে:

رَبُّ الۡمَشۡرِقَیۡنِ وَ رَبُّ الۡمَغۡرِبَیۡنِ

❝তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের রব।❞ [৫৫:১৭]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সূর্য উদিত হওয়ার দুটি পৃথক জায়গা এবং অস্তমিত হওয়ারও দুটি পৃথক জায়গা।

প্রতিদিন সূর্য পূর্বের ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উদয় হয় এবং তা পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্ত যায়। এই হিসাবে উদয়াচলও অনেক এবং অস্তাচলও অনেক।

এগুলোকে নিয়েও অনেকে গোল পৃথিবী প্রমাণের জন্য উঠে আসে। তাঁরা মনে করে সমতল পৃথিবীতে আবার সূর্যদয়-সূর্যাস্ত কিভাবে সম্ভব, সমতল হলে তো পুরো পৃথিবী একসাথে দিন হয়ে যাবে। তাঁদের এই সংশয়টা জন্মেছে মূলত হেলিওসেন্ট্রিজমের ওপর আগে থেকে বিশ্বাস থাকার কারণে। যেহেতু মাথায় একটা কল্পিত সৌরজগতের ছবি নিয়ে বড়ো হয়েছি তাই এসব সংশয়গুলো শুরুর দিকে সবারই আসে।বইয়ের শেষে এসব সংশয়গুলো নিরসন করা হয়েছে।
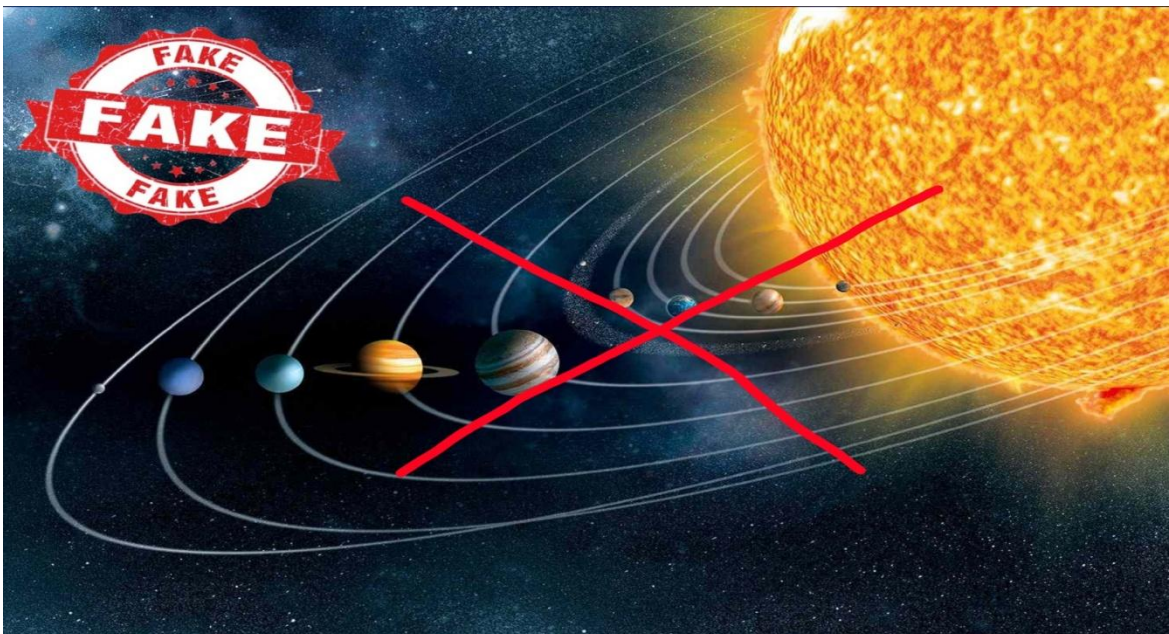
৮. দিন ও রাত

এই অধ্যায়ে আমরা জানবো যে সূর্যের চলনগমনের জন্যই রাত ও দিন হয়না, বরং রাতদিন মহান আল্লাহর পৃথক নিদর্শনাবলী।

১) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ جَعَلۡنَا الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ اٰیَتَیۡنِ فَمَحَوۡنَاۤ اٰیَۃَ الَّیۡلِ وَ جَعَلۡنَاۤ اٰیَۃَ النَّهَارِ مُبۡصِرَۃً لِّتَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِیۡنَ وَ الۡحِسَابَ ؕ وَ کُلَّ شَیۡءٍ فَصَّلۡنٰهُ تَفۡصِیۡلًا

❝আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দু’ টো নিদর্শন। অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।❞ [১৭:১২]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

তাঁরই হাতে রয়েছে পর্যায়ক্রমে দিবস ও রজনীর গমনাগমন। তিনি রাত্রির পর্দা দিনের উপর এবং দিনের পর্দা রাত্রির উপর চড়িয়ে থাকেন।

তিনি অন্যত্রে বলেন:

وَمِنْ عَايَتِهِ الْيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

❝তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) কর।❞ [৪১:৩৭]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্য হলো আল্লাহ তাআ'লার কুদরতের নিদর্শন। রাতকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দিনকে আলোকময় বানিয়েছেন। এগুলো বিরামহীনভাবে একটার পিছনে আরেকটা আসতে থাকে।

তিনি অন্যত্রে বলেন:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوۡرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ یَعۡدِلُوۡنَ

❝সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। এরপরও কাফেরগণ তাদের রব-এর সমকক্ষ দাঁড় করায়।❞ [৬:১]

তিনি অন্যত্রে বলেন:

فَالِقُ الۡاِصۡبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّیۡلَ سَکَنًا وَّ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ حُسۡبَانًا ؕ ذٰلِکَ تَقۡدِیۡرُ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ

❝তিনি ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনি রাত সৃষ্টি করেছেন শান্তি ও আরামের জন্য, সূর্য ও চন্দ্র বানিয়েছেন গণনার জন্য। এসব মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞাতা কর্তৃক নির্ধারিত।❞ [৬:৯৬]

তাফসীরে জাকারিয়া:

অর্থাৎ, তিনি ধীরে ধীরে অন্ধকার চিরে আলোর উন্মেষ ঘটান। সে আলোতে মানুষ তাদের জীবিকার জন্যে বের হতে পারে। [সাদী]

২) আল্লাহ ﷻ দিন ও রাতের শপথ করে বলেন:

وَ النَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۪ۙ

❝শপথ দিনের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে❞ [৯১:৩]

وَ الَّیۡلِ اِذَا یَغۡشٰىهَا ۪ۙ

❝শপথ রাতের, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে❞ [৯১:৪]

তাফসীরে জাকারিয়া:

অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। এর অর্থ, সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো, শপথ রাত্রির, যখন তা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে; ফলে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। [কুরতুবী]

তিনি অন্যত্রে শপথ করে বলেন:

وَ الَّیۡلِ اِذَا یَغۡشٰی

❝শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে❞

وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی

❝শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়❞ [৯২:১-২]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হি):

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাত্রির শপথ করেছেন যার অন্ধকার সমস্ত পৃথিবীকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং দিনের শপথও করেছেন যখন তা রাত্রির অমানিশাকে বিদূরিত করে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

কাতাদাহ রাঃ হতে বর্ণিত, 'রাত্রির শপথ যখন তা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে এবং শপথ দিনের, যখন তা উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে'। এই আয়াত দুইটি খুবই গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। দুটি মহান নিদর্শন যা আল্লাহ সৃষ্টির চারপাশে জড়িয়ে দেন।

[তাফসীরে তাবারী]

৩) নীচের আয়াত দুটি দেখুন, মহান আল্লাহ এই দিন ও রাত মাখলুক দুটিকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেওয়ার বিষয়েও বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلۡ اَرَءَیۡتُمۡ اِنۡ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیۡکُمُ الَّیۡلَ سَرۡمَدًا اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ مَنۡ اِلٰهٌ غَیۡرُ اللّٰهِ یَاۡتِیۡکُمۡ بِضِیَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسۡمَعُوۡنَ

❝বলুন, আমাকে জানাও, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন ইলাহ আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?❞ [২৮:৭১]

তিনি অন্যত্রে বলেন:

قُلۡ اَرَءَیۡتُمۡ اِنۡ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیۡکُمُ النَّهَارَ سَرۡمَدًا اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ مَنۡ اِلٰهٌ غَیۡرُ اللّٰهِ یَاۡتِیۡکُمۡ بِلَیۡلٍ تَسۡکُنُوۡنَ فِیۡهِ ؕ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ

❝বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ছাড়া এমন কোন ইলাহ আছে, যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যাতে বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?❞ [২৮:৭২]

৪) রাত-দিন স্বতন্ত্র মাখলুক, তারাও চন্দ্র-সূর্যের মতো কক্ষপথে ঘুর্নায়মান।

মহান আল্লাহ বলেন:

لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

❝সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, রজনীও দিবসকে অতিক্রম করতে পারে না এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।❞ [৩৬:৪০]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। ইবনে আব্বাস রাঃ, ইকরামা রঃ, দাহহাক রঃ, হাসান রঃ, কাতাদাহ রঃ, আতা আল-খুরাসানী রঃ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সালাফগণ বলেনঃ এ কক্ষপথটি (ফালাক) হচ্ছে চরকার বৃত্তের পরিধির মতো।

তিনি অন্যত্রে বলেন:

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

❝আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।❞ [২১:৩৩]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করছেন: তোমরা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য কর এবং দিন ও ওর আলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারপর এ দুটোর পরস্পর ক্রমাগত

সুশৃংখলভাবে গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য কর এবং একটি কমে যাওয়া ও অপরটি বেড়ে যাওয়া।

লক্ষ্য করুন দেখুন, আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে চন্দ্র-সূর্যের সাথে রাত-দিনকেও পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি রাত-দিনকে চন্দ্র-সূর্যের আগে উল্লেখ করেছেন। আবার বলা হচ্ছে, রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্য সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণশীল।

৫) আলো ও অন্ধকার চাঁদ সূর্যের আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে:

* হযরত ইকরামা রঃ হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনু আব্বাসকে রাঃ জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “পূর্বে রাত ছিল, না দিন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল। তা হলে এটাতো প্রকাশমান যে, তাতে অন্ধকার ছিল। আর অন্ধকারের নামইতো রাত। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, পূর্বে রাতই ছিল।"

[তাফসীরে ইবনে কাসীর,২১:৩৩ আয়াতের তাফসীর]

* রাসূল ﷺ এক হাদীসে সৃষ্টির সূচনা বলতে গিয়ে বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা...আলো সৃষ্টি করেন বুধবার দিন....। *[মুসলিম ২৭৮৯]*

৬) দিন ও রাতের পালাবদল সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ একাধিক আয়াতে বলেন:

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ

❝আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান।❞ [৩:২৭]

তিনি অন্যত্রে বলেন:

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ؕ وَ هُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

❝তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।❞ [৫৭:৬]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটানো তাঁরই কাজ। স্বীয় হিকমতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনো দিন বড় করেন ও রাত্রি

ছোট করেন এবং কখনো রাত্রি বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনো দুটোকেই সমান করে দেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوۡلِجُ الَّيۡلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوۡلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيۡلِ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌۢ بَصِيۡرٌ

❝এটা এ জন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ রাতকে প্রবেশ করান দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।❞ [২২:৬১]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

কখনো দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়, আবার কখনো রাত্রি বড় হয় ও দিন ছোট হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে হয়ে থাকে।

يُوۡلِجُ الَّيۡلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوۡلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيۡلِ

❝তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান...❞ [৩৫:১৩]

يُغۡشِى الَّيۡلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ

❝তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।❞ [১৩:০৩]

وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيۡلُ ۚۖ نَسۡلَخُ مِنۡهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمۡ مُّظۡلِمُوۡنَ

❝আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নেই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।❞ [৩৬:৩৭]

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ۚ یُکَوِّرُ الَّیۡلَ عَلَی النَّہَارِ وَ یُکَوِّرُ النَّہَارَ عَلَی الَّیۡلِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ کُلٌّ یَّجۡرِیۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ اَلَا ہُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفَّارُ

❝তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখ, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।❞ [৩৯:৫]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

দিবস ও রজনীর পরিবর্তনও তাঁরই হুকুমে হচ্ছে। তাঁর নির্দেশক্রমে দিনরাত্রি শৃংখলার সাথে একের পিছনে আর একটি বরাবরই চলে আসছে। একটির পর অপরটি আসে না এমন কোন সময়ই হয় না।

সুতরাং, জানা গেলো যে দিন ও রাত পৃথক মাখলুক, সূর্যের আলোতেই দিন হয় ব্যাপারটি এমন নয়। দিনের রয়েছে উজ্জ্বলতা আর রাতের কালো অন্ধকার। সূর্য চাঁদের মতো এই দুটিও অবিরাম ঘুরতে আছে। দিনের আলো বাস্তবেও পর্যবেক্ষণযোগ্য। সাহরির সময় শেষ হওয়ার পর থেকেই দিন শুরু হয়ে যায়। সূর্য উদিত হয় এর আরো দেড়ঘন্টা পরে। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে আমরা যে আলোটি দেখি সেটিই দিনের আলো। দিনের আলো নাতিশীতোষ্ণ ও কোমল হয়ে থাকে। অপর দিকে সূর্যের আলোতে থাকে উঞ্চতা।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কখনও ঘটলে দেখবেন, এই সময় সূর্য প্রায় পুরোটাই ব্লক হয়ে যায়। এই পূর্ণগ্রহণের সময় কি কখনো রাতের মতো কালো আঁধার নেমে আসে?- না, কালো অন্ধকার নেমে আসে না। ঠিক সূর্যোদয়ের পূর্বে আমরা যেমন আলো দেখি তখনও সেরকম আলো থাকে। অর্থাৎ, দিনের আলো বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

যদি দিনের স্বতন্ত্র আলো না থাকতো অর্থাৎ, সূর্যই যদি দিনের আলোর উৎস হতো, তাহলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সাথে সাথে রাত নেমে আসতো। এমন তো হয় না!

এছাড়াও ঘনকালো রাত্রির আবরন সর্বত্র বিরাজ করে কিন্তু দিনের বেলায় ঘন মেঘের আড়ালে প্রখর সূর্য ঢাকা পড়লেও দিনের আলো রাত্রির ন্যায় অন্ধকার হতে দেয় না, নূন্যতম গোধূলি/সুবহে সাদিকের ন্যায় আলো টিকে থাকে। সূর্যকে আল্লাহ মূলত হিসাবের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দিন সৃষ্টি এর কাজ নয়, তবে দিবালোক আরো প্রখর এবং উজ্জ্বল করে সূর্যরশ্মি।

মহান আল্লাহ বলেন:

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ۟ یُغۡشِی الَّیۡلَ النَّهَارَ یَطۡلُبُهٗ حَثِیۡثًا ۙ وَّ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ وَ النُّجُوۡمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمۡرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الۡخَلۡقُ وَ الۡاَمۡرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِیۡنَ

❝ নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব। ❞ [৭:৫৪]

উপরের আয়াতে উল্লিখিত চাঁদ সূর্য, দিন রাত্রিকে একে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা প্রমানের অনেকে বৃথা চেষ্টা চালাবেন, তাদেরকে বলি, চাঁদের সাথে রাতের এবং সূর্যের উপর দিনের নির্ভরশীলতা বোঝানো হলে ক্রমধারা এরূপ হত যেঃ চাঁদ-সূর্য এবং রাত্রি-দিন অথবা দিন-রাত্রি এবং সূর্য-চন্দ্র। কিন্তু আল্লাহ ক্রমধারা বজায় রাখেননি। অর্থাৎ এর মানে দাঁড়ায় সবগুলি একে অন্যের থেকে স্বাধীন। দিন-রাত্রির সমান্তরালে (একের পিছনে আরেকটির) আবর্তনের দৃশ্য পর্যবেক্ষণযোগ্য। দিন রাত্রির পাশাপাশি অবস্থানের দৃশ্য একটি সমুদ্রে অবস্থানকারী জাহাজ থেকে কেউ একজন ধারন করে। এতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় একদিকে দিনের গোধূলির আলো অন্যদিকে রাতের নিকষ আঁধারের চাদর। আর উত্তর মেরু তথা আলাস্কা থেকে এগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।

দেখুনঃ https://youtu.be/5QVdFThN0Rg?feature=shared
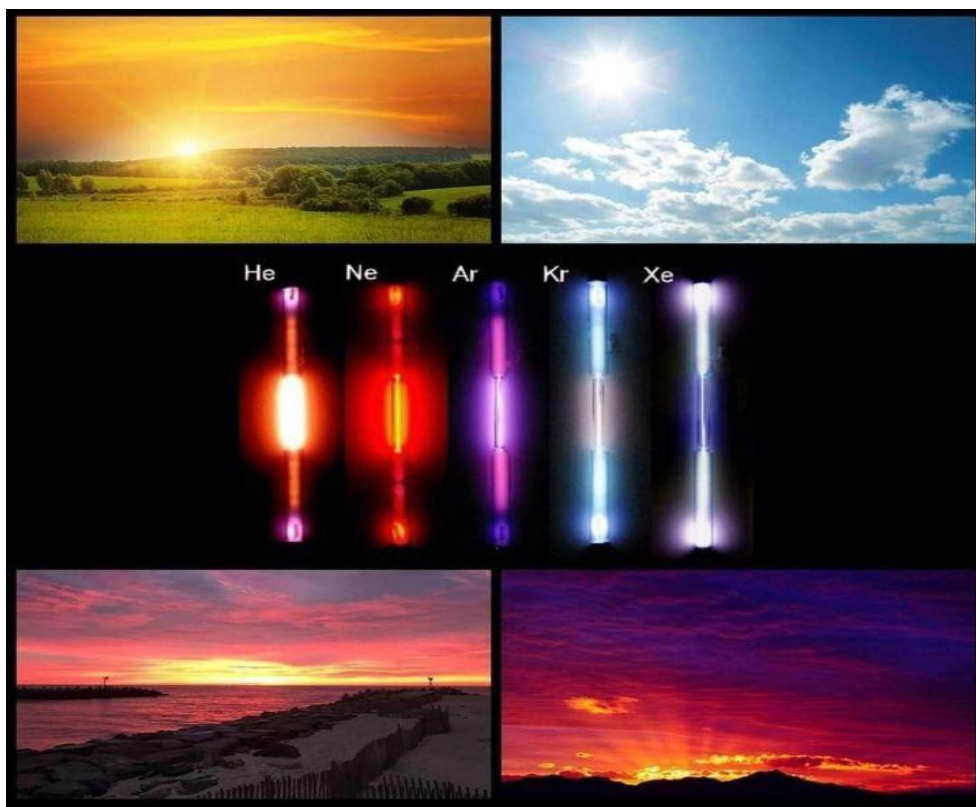
দিনের আলো ও সূর্যের আলোর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন এক ফ্ল্যাট আর্থার গবেষক।

দেখুনঃ https://youtu.be/M-cQd-bwwmw?feature=shared

আল্লাহু আ'লাম।

৯. গম্বুজাকৃতিবিশিষ্ট আসমান

কথিত মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মজবুত আকাশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। আমরা উপরে তাকালে যা দেখি তাদের মতে সেটা অসীম মহাশূন্য। অর্থাৎ, মহাশূন্যকেই আমরা আকাশ বলে থাকি। আসলেই কি তাই?

আকাশ মহাশূন্য নাকি সলিড:-

১) মহান আল্লাহ বলেন:

وَّ بَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا

❝আর আমি তোমাদের উপরে বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় আকাশ।❞ [৭৮:১২]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হি):

আল্লাহ তা'আলার বাণী: আমি তোমাদের উপর বানিয়েছি অর্থাৎ আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছি। আরবের প্রচলিত নিয়মে ঘরের ছাদকে তারা মূল ভিত্তি হিসেবে মনে করত। যেহেতু আকাশ-যমীনের জন্য ছাদ স্বরূপ, সে জন্য আল্লাহ-রাব্বুল আলামীন আরববাসীদের সহজে বুঝার জন্য "বানায়না" {بَنَيۡنَا} শব্দ উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ পৃথিবীর ছাদ বা আকাশ। যা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মজবুত। কালচক্রের প্রবাহ সেখানে আজও এতটুকু ফাটল বা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

২) মহান আল্লাহ অন্যত্রে বলেন:

وَ يُمۡسِكُ السَّمَآءَ اَنۡ تَقَعَ عَلَى الۡاَرۡضِ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ

❝আর তিনিই আসমানকে আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা যমীনের উপর পড়ে না যায়।❞ [২২:৬৫]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন। ওটা যমীনের উপর পড়ে যাচ্ছে না। তিনি ইচ্ছা করলে এখনই আসমান যমীনের উপর পড়ে যাবে এবং যমীনের অধিবাসী সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে আমরা উপরের দিকে তাকিয়ে যা দেখি সেটা "শূন্য", "বায়ুমন্ডলের স্তর" বা এ জাতীয় কিছু নয়, বরং এটা সুবিশাল মজবুত ছাদ। প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত অপবিজ্ঞান আমাদেরকে আকাশ বলতে উন্মুক্ত-অসীম ভ্যাকুয়াম স্পেসকে বোঝায় যার বিস্তার শুরু হয়েছে 'বিগব্যাঙ' নামের যাদুশাস্ত্রের অনুসারী, তথা কাব্বালিস্টদের স্ক্রিপচার (জোহার) থেকে নেওয়া কাল্পনিক কুফরভিত্তিক ঘটনা থেকে। এ অপবিজ্ঞানের ভাষায় আসমান বলতে আদৌ নিরেট কিছুকে বোঝায় না। বরং তাদের ভাষায় 'মহাশূন্যের' অসীম শূন্যতাই আসমান। এ ব্যাপারে পাঠকরা উত্তম জানেন। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা স্পষ্টভাবে একে যমীনের উপর ছাদ বলেছেন। এটা আদৌ শূন্য/স্পেস জাতীয় কিছু নয় বরং সলিড মজবুত ছাদ। বাস্তবিক পর্যবেক্ষনেও এটাই সত্য হিসেবে দেখা যায়।

আকাশ পৃথিবীর উপরে, চারপাশে নয়:-

১) মহান আল্লাহ বলেন:

اَفَلَمۡ یَنۡظُرُوۡۤا اِلَی السَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ کَیۡفَ بَنَیۡنٰهَا وَ زَیَّنّٰهَا وَ مَا لَهَا مِنۡ فُرُوۡجٍ

❝তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোন ফাটল নেই।❞ [৫০:৬]

২) মহান আল্লাহ অন্যত্রে বলেন:

الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً

❝যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন.....❞ [২:২২]

তাহলে সরাসরি পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা বুঝতে পারলাম আকাশ পৃথিবীর উপরে, চারপাশে নয়। নীচের আয়াতে এটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায়।

৩) মহান আল্লাহ বলেন:

وَّ بَنَیۡنَا فَوۡقَکُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا

❝আর আমি তোমাদের উপরে বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় আকাশ।❞ [৭৮:১২]

এখানে দেখুন, আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে আকাশ আমাদের উপরেই রয়েছে।চারিপাশে নয়। বল পৃথিবী মুতাবিক আকাশ চারদিকেই, অর্থাৎ উওর মেরুতে যিনি থাকবেন তার আকাশ উপরে; দক্ষিন মেরুতে যিনি থাকবেন তার আকাশ নিচের দিকে। এক কথায় একটা বিরাট অসামঞ্জস্যতা। কিন্তু সমতলে আপনি যেখানেই থাকুন না কেনো, আকাশ সব সময় আপনার উপরেই থাকবে এবং আকাশ হলো পৃথিবীর ছাদ। বুঝার সুবিধার্থে পৃথিবী ও আকাশকে আপনার বাসার ফ্লোর ও ছাদের সাথে তুলনা করতে পারেন। এবং এই আয়াত থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে আকাশের সংখ্যা সাতটি।

আকাশের প্রকৃতি:-

১) মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۪

❝যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন.....❞ [২:২২]

তাফসীরে তাবারি (৩১০হি):

"আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে সমতল বানিয়েছেন, যেন এর উপর মানুষ চলাচল করতে পারে। স্থির করেছেন, যেন মানুষ এতে বসবাস করতে পারে। ইবনে মাসউদ ও আরো কিছু সাহাবি (রাযি.) বলেন: ❝আকাশ পৃথিবীর উপর গম্বুজ সদৃশ ছাদ।❞

তাফসীরে আদ দুররুল মানসুর (৯১১হিজরী):

ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিম ইবনে মাসউদ রা: এবং সাহাবীদের থেকে তাঁর বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন: ❝যিনি পৃথিবীকে তোমার জন্য বিছানা বানিয়েছেন।❞-[২:২২]। তিনি বললেন: "এটি একটি ফিরাশ (فراش) (বিছানা বা গদি) যার উপর আপনি হাঁটছেন। এবং এটি হল 'মিহাদ' (বিছানা বা সমতল ভূমি) এবং "কারার" (দৃঢ় ও স্থির স্থান) এবং আকাশ হল ছাদ।' তিনি বললেন: "তিনি পৃথিবীর উপর আকাশকে গম্বুজের আকৃতিতে নির্মাণ করেছেন এবং এটি পৃথিবীর ছাদ"।

২) মহান আল্লাহ অন্যত্রে বলেন:

اَللّٰهُ الَّذِیۡ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا

❝আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ।❞

[১৩:২]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

ইমাম ইবনে কাসীর রঃ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, আইয়াস ইবনু মুআ'বিয়া (রঃ) বলেন: আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোন স্তম্ভ নেই..।

তাফসীরে জাকারিয়া:

অর্থাৎ আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি আসমানসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আসমানসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ।

যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, আশ-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "...এবং 'আলেমদের ইজমা সম্পর্কে: তারপর তাবি'য়ীনদের বসরার বিখ্যাত ইমাম ও বিচারক আইয়াস বিন মুআ'বিয়া বলেছেন: السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلُ الْقُبَّةِ

আকাশ পৃথিবীর উপর গম্বুজের মত।"

[মাজমু' আল ফাতাওয়া ২৫/১৯৪-৯৫]

[উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর ওপর গম্বুজাকৃতির আকাশ থাকার জন্য পৃথিবীকে সমতল হওয়া আবশ্যক]

অর্থাৎ আমরা যে এই আসমানকে গম্বুজ সদৃশ বলছি, এটা আমাদের মনগড়া কিছু নয়, বরং সরাসরি সাহাবীদের (রাঃ) আকিদা (বিশ্বাস)। এই গম্বুজাকৃতির আসমানের বিশ্বাসের বিষয়টি সাহাবীদের (রাঃ) ছাড়াও অতীতের জমহূর আলিম, মুফাসসীরগনও এটাই বিশ্বাস করতেন। তাঁরা একেই কুরআন সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ন বলে উল্লেখ করেছেন। যারা বলতে চায়, গম্বুজাকৃতির আসমান স্তম্ভবিহীন আসমানের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক (!) এরা বস্তুত সাহাবী (রাঃ), মুফাসসীরীন ও গ্রীক দর্শন আরবে প্রবেশ পূর্ব জমহূর উলামাদের চেয়েও বেশি বোঝেন! আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। গম্বুজাকৃতির আসমান জমিনের প্রান্তসীমায় কিরূপ

অবস্থায় আছে সেসম্পর্কে মহান আল্লাহ সর্বোত্তম জানেন। আর কোন আসমান কি দিয়ে তৈরি তাও মহান আল্লাহ সর্বোত্তম জানেন।

সাতটি আকাশের মধ্যে ব্যবধান:-

১) রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ব্যবধান কতটুকু? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন: উভয়ের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্ব এবং এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচশ বছর আর প্রত্যেক আকাশের পুরুত্ব হলো পাঁচশ বছর।

[ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ ও তিরিমিযী রঃ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী রঃ হাদীসটি হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।]

[আল বিদায় ওয়ান নিহায়া, ১ম খন্ড]

২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

« ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمس مئة عام ومابين كل سماء مسيرة خمس مائة عام وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة خمس مئة عام وما بين الكرسي والماء مسيرة خمس مئة عام والعرش على الماء والله عز و جل على العرش يعلم ما أنتم عليه»

❝দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এমনি সপ্তমাকাশ এবং কুরসীর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়।❞

[হাম্মাদ বিন সালামা হতে এই হাদীছ ইবনে মাহদী বর্ণনা করেন আসেম হতে, আসেম বর্ণনা করেন যির্‌ হতে, তিনি বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে। অনুরূপ বর্ণনা করেন মাসউদী আসেম হতে, তিনি আবি ওয়ায়েল হতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী (রঃ) উপরোক্ত সনদ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ অনেক সনদে এই বর্ণনা এসেছে।]

৩) **তাফসীরে জাকারিয়া:-**

বিভিন্ন বর্ণনায় এটা এসেছে যে, যমীনের আশেপাশে যা আছে যেমনঃ বাতাস, পানি ইত্যাদি প্রথম আসমান এ সবগুলোকে সবদিক থেকে সমভাবে বেষ্টন করে আছে। যে কোন দিক থেকেই প্রথম আসমানের দিকে যাত্রা করা হউক না কেন তা পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বে রয়েছে। আবার প্রথম আসমান বা নিকটতম আসমানের দূরত্বও পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের মত। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আসমানও প্রথম আসমানকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছে। এ দুটোর দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের মত। আবার দ্বিতীয় আসমানের পুরুত্বও পাঁচশত বছরের রাস্তার মত। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানও তদ্রুপ দূরত্ব ও পুরত্ব বিশিষ্ট।

মহান আল্লাহ সর্বোত্তম জানেন।

আকাশের দরজা:-

আকাশের কি দরজা আছে ? জ্বি! আছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আয়াত আছে আর হাদীসেও আকাশের দরজা সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা এসেছে। তবে তার ধরণ সম্পর্কে আমরা জানিনা।

১) মহান আল্লাহ বলেন:

وَ لَوۡ فَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوۡا فِیۡهِ یَعۡرُجُوۡنَ

❝আর যদি আমি তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দিতাম, অতঃপর তারা তাতে আরোহণ করতে থাকত।❞ [১৫:১৪]

২) মিরাজের হাদীসে এসেছে,

❝.....আমরা যখন প্রথম আসমানে গিয়ে পৌছলাম, তখন জিবরীল (আঃ) এ আসমানের দারোয়ানকে বললেন, দরজা খুলুন, তিনি বললেন কে? বললেন, জিবরীল। দারোয়ান বললেন, আপনার সাথে কি অন্য কেউ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার সাথে মুহাম্মাদ ﷺ আছেন।

দারোয়ান বললেন, তার কাছে আপনাকে পাঠানো হয়েছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর দরজা খুলে দেয়া হল..............তারপর জিবরীল (আঃ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বারোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌছলেন এবং এর দারোয়ানকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি প্রথম আসমানের দারোয়ানের ন্যায় প্রশ্নোত্তর করে দরজা খুলে দিলেন...❞

[মুসলিম ৩০৪]

৩) ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ❝রংধনু হলো পৃথিবীবাসীর জন্য মহাপ্লাবনের পর নিরাপত্তার প্রতীক এবং ছায়াপথ হলো আকাশের একটি দরজা, যা থেকে আকাশ বিদীর্ণ হবে।❞ *[আল আদাবুল মুফরাদ ৭৭২]*

সুতরাং, আসমানে দরজা আছে তা স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

আসমান থেকে বৃষ্টি:-

বৃষ্টি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীবাসীর জন্য রহমত। আধুনিক অপবিজ্ঞান আমাদেরকে শেখায় দুনিয়ার যাবতীয় পানির উৎস এই কাল্পনিক মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো গোলক পৃথিবীই। এখানে পানি নাযিল হবার মত কোন বিষয় ঘটে না, বরং এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কথিত পানির চক্রেরই ফসল, এই বর্ষন প্রক্রিয়ায় কোন অলৌকিকতা বা সৃষ্টিকর্তার করুনার মত কোন বিষয় নেই। এরা আজ নিজেরাই জলীয়বাষ্প তৈরিকারী যন্ত্রের দ্বারা এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৃষ্টি ঘটানোর কাজে সক্ষমতা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ তারা তাদের থিওরি এবং প্রায়োগিক কার্যের মাধ্যমে বোঝাতে চায় যে এই বারি বর্ষণ সম্পূর্ন স্রষ্টার কর্তৃত্বহীন প্রাকৃতিক ঘটনা। বস্তুত, কাফিরদের বলা সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বার্তাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ﷻ অস্তিত্বের বিশ্বাসটিকেই ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া। ওরা রহমানের নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। আল্লাহ ﷻ বলেন:

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

❝তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নূর (দ্বীন-ইসলাম)কে পূর্ণত্বে পৌঁছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না, যদিও অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে করে।❞ [৯:৩২]

আনাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের উপর বৃষ্টি আরম্ভ হলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং শরীর থেকে জামা খুলে ফেললেন, যাতে তাঁর শরীরে বৃষ্টি পৌঁছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা করলেন কেন? তিনি বললেনঃ এ বৃষ্টি তার রবের পক্ষ থেকে বর্ষিত হচ্ছে।

[সহীহ, সুনান আবূ দাউদ, ৫১০০, মুসলিম ৮৯৮, আহমাদ]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বৃষ্টির দ্বারা দুধরনের পানি বর্ষন করেন, একটা হচ্ছে আসমান থেকে সরাসরি রহমতের বারিধারা। আরেকটি হচ্ছে যমীনের জলাধারগুলো থেকে শুষ্কবায়ুতে টেনে নেওয়া পানি। কিন্তু মূল পানির উৎস আসমানই। আজকের অপবিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে বর্ষণের জন্য অনেক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, এরা ঘন জলীয়বাষ্পকে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে কৃত্রিম বৃষ্টির সৃষ্টি করে বোঝাতে চায়, এই সৃষ্টিজগতের সমস্ত রহস্য তাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে। তারা এর দ্বারা বৃষ্টিধারা প্রেরণে রহমান আল্লাহর নিয়ন্ত্রন এবং অনুগ্রহকে অস্বীকার করতে চায়।

দেখুনঃ https://youtu.be/bxfA2IaKaJQ?feature=shared

বস্তুত তারা যা করে সেটা মূল বারিধারার উৎস নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেন। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে একাধিক আয়াতে আসমান থেকে পানি বর্ষণের কথা বলেন।

১) আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَ مَآ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنۡ مَّآءٍ فَاَحۡیَا بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا

❝...এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তার মাধ্যমে মরে যাওয়ার পর যমীনকে জীবিত করেছেন...❞ [২:১৬৪]

২) তিনি অন্যত্রে বলেন:

وَ هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖ نَبَاتَ کُلِّ شَیۡءٍ

❝আর তিনিই আসমান থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর আমি এ দ্বারা উৎপন্ন করেছি সব জাতের উদ্ভিদ।❞ [৬:৯৯]

৩) তিনি অন্যত্রে বলেন:

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۫ فَتُصۡبِحُ الۡاَرۡضُ مُخۡضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیۡفٌ خَبِیۡرٌ

❝তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার ফলে যমীন সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ স্নেহপরায়ণ, সর্ববিষয়ে সম্যকজ্ঞাত।❞ [২২:৬৩]

৪) তিনি অন্যত্রে বলেন:

وَ هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ الرِّیٰحَ بُشۡرًۢا بَیۡنَ یَدَیۡ رَحۡمَتِهٖ ۚ وَ اَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوۡرًا

❝আর তিনিই তাঁর রহমতের বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমরা আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করি।❞ [২৫:৪৮]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

হযরত খালিদ ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা একদা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় জনগণ পানি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে। তখন আমি বলি, এক প্রকার পানি হলো ঐ পানি যা আকাশ হতে বর্ষিত হয়। আর এক প্রকার পানি হলো ঐ পানি যা সমুদ্র হতে উথিত মেঘমালা পান করিয়ে থাকে। সমুদ্রের পানি উদ্ভিদ জন্মায় না, বরং আকাশ হতে বর্ষিত পানি উদ্ভিদের জন্ম দেয়।" [এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন]

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, যখনই আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষণ করেন তখনই যমীনে উদ্ভিদের জন্ম হয় অথবা সমুদ্রে মণিমুক্তা জন্ম হয়। অন্য কেউ বলেন যে, স্থলে গম ও সমুদ্রে মুক্তার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ওর দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি। অর্থাৎ যে ভূমি দীর্ঘাদন যাবত পানির জন্যে অপেক্ষমান ছিল এবং পানি না হওয়ার কারণে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তাতে না ছিল কোন গাছ-পালা, না ছিল কোন তরু-লতা, অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন তখন সেই মৃত প্রায় ভূমি নব-জীবন লাভ করলো এবং তাতে বৃক্ষ ও তরু-লতার জন্ম হলো ও সেগুলো ফলে-ফুলে ভরে উঠলো।

৫) আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنۡ جِبَالٍ فِیۡهَا مِنۡۢ بَرَدٍ فَیُصِیۡبُ بِهٖ مَنۡ یَّشَآءُ وَ یَصۡرِفُهٗ عَنۡ مَّنۡ یَّشَآءُ ؕ

❝আর তিনি আকাশে অবস্থিত মেঘের পাহাড়ের মধ্যস্থিত শিলাস্তুপ থেকে বর্ষণ করেন শিলা অতঃপর এটা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তার উপর থেকে এটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন।❞ [২৪:৪৩]

তাফসীরে আহসানুল বায়ান:

এর একটি অর্থ এই যা অনুবাদে প্রকাশ হয়েছে। তা হল, আসমানে শিলার পাহাড় আছে; যেখান থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন (ইবনে কাসীর)। দ্বিতীয় অর্থ হল سماء অর্থ উঁচু। আর جبال অর্থ হল পাহাড়ের সমতুল্য বড় বড় টুকরো। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ আসমান হতে কেবল বৃষ্টিই বর্ষণ করেন না, বরং উঁচু থেকে যখন চান বড় বড় বরফের টুকরোও বর্ষণ করেন। (ফাতহুল কাদীর) কিম্বা পাহাড় সদৃশ বিশাল বিশাল মেঘখন্ড হতে শিলা বর্ষণ করেন।

৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ هُوَ الَّذِیۡ یُرۡسِلُ الرِّیٰحَ بُشۡرًۢا بَیۡنَ یَدَیۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتۡ سَحَابًا ثِقَالًا سُقۡنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنۡزَلۡنَا بِهِ الۡمَآءَ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ کَذٰلِکَ نُخۡرِجُ الۡمَوۡتٰی لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ

❝আর তিনিই সে সত্তা; যিনি তার রহমত বৃষ্টির আগে বায়ু প্রবাহিত করেন সুসংবাদ হিসেবে, অবশেষে যখন সেটা ভারী মেঘমালা বয়ে আনে তখন আমরা সেটাকে মৃত জনপদের দিকে চালিয়ে দেই, অতঃপর আমরা তার দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর তা দিয়ে সব রকমের ফল উৎপাদন করি। এভাবেই আমরা মৃতদেরকে বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।❞ [৭:৫৭]

সাহাবায়ে কেরামের সমকালীন তাবি'ঈ সূদী রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ১২৭হিজরী] এই আয়াতের তাফসিরে বলেন:

আল্লাহ তাআ'লার প্রেরিত বাতাস আসমান-জমিনের সংযোগস্থল হতে মেঘমালা বের করে নিয়ে আসে। অতপর আল্লাহ তাআ'লা সে মেঘমালাকে আসমানে যেভাবে চান সেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন; তারপর আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেন, ফলে সেই মেঘমালার উপর আসমানের জলরাশি আপতিত হয়। তারপর মেঘমালা বৃষ্টি বর্ষণ করে। *[তাফসীরে তাবারি]*

সুতরাং বৃষ্টি বর্ষণ করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাজ, তার শক্তি ও ক্ষমতাধীন। এতে কোনো সৃষ্টির প্রভাব নেই। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

❝তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি তা মেঘ হতে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি?❞ [৫৬:৬৮-৬৯]

সুতরাং যে ব্যক্তি তারকাসমূহ কিংবা প্রাকৃতিক কারণ যেমন পৃথিবীর পরিবেশগত কারণ ও বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি হয় বলে ধারণা করে তারা মিথ্যা বলে এবং অপবাদ রটায়। এসব ধারণা বড় শিরক। আর যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা ‘আলাই বৃষ্টি বর্ষণকারী, কিন্তু রূপকার্থে বৃষ্টির সম্বন্ধ এগুলোর প্রতি করে, তাহলে এটিও হারাম এবং ছোট কুফুরী। কেননা এতেও আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে নিয়ামতের সম্বন্ধ করা হয়। যেমন কেউ কেউ বলে থাকে অমুক অমুক তারকার মাধ্যমে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি।

[আল ইরশাদ-সহীহ আকীদার দিশারী]

আজও এরকম মুসলিম বিদ্যমান, যারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস রাখে না যে, আল্লাহ ৬ দিনে আসমান যমীনকে সৃষ্টি করেছেন বরং বিশ্বাস করে বিগব্যাং এর দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বাস করে পৃথিবী গোলক বল সূর্যের চারিপাশে মহাশূন্যে ঘুরছে। তাঁদের মতে এই পৃথিবীর বাহিরে মহাশূন্য, বিজ্ঞান অনুযায়ী এই ভ্যাকুয়াম স্পেস থেকে পানি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্যে আসা হাস্যকর অযৌক্তিক কল্পনা। তাই আধুনিক মুসলিমরা আসমান থেকে পানি নাযিল হবার বিষয়টিকে অবিশ্বাস করে, এজন্য তারা যুক্তি ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়, কল্পবিজ্ঞানীদের অপবিজ্ঞানকে ইসলামের সাথে সমন্বয়ের চেষ্টা করে। আল্লাহ যমীনের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ থেকেও পানি বর্ষণ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ একদম স্পষ্টভাবে বলেন নূহ আঃ এর কওমের উপর গজবের ব্যাপারে আসা আয়াতে। আল্লাহ ﷻ ঐসময় আসমানের দরজাকে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য খুলে দেন।

৭) আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَفَتَحۡنَآ اَبۡوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنۡهَمِرٍ

❝তখন আমি আকাশের দরজাগুলো খুলে দিয়ে মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিয়েছিলাম।❞ [৫৪:১১]

[যেটা ছিল নুহ আ. এর কওমের ওপর শাস্তি।]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

আকাশ হতে মুষলধারের বৃষ্টির দরযা খুলে দিলেন এবং যমীন হতে উথলিয়ে ওঠা পানির প্রস্রবণের মুখ খুলে দিলেন। এমন কি যা পানির জায়গা ছিল না, যেমন উনান ইত্যাদি হতে পানি উঠতে লাগলো। চতুর্দিক পানিতে ভরে গেল। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হলো না এবং যমীন হতে পানি উঠাও বন্ধ হলো না। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এটা চলতেই থাকলো। আকাশের মেঘ হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সময় আকাশ হতে পানির দরযা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হচ্ছিল।

হযরত আলী রাঃ বলেন যে, আকাশের মুখ খুলে দেয়া হয় এবং ওগুলো দিয়ে অনবরত পানি বর্ষিত হতে থাকে।

৮) ইবনুল কাওয়া রহঃ আলী রাঃ-কে ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তা হলো আসমানের প্রবেশদ্বার এবং নূহের বন্যায় প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আকাশের ঐ দ্বারই খুলে দেয়া হয়েছিল।

[আল আদাবুল মুফরাদ ৭৭১]

আর এই আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ার বিষয়টা অনেকেরই অস্বাভাবিক লাগতে পারে, এমনকি অনেকে অস্বীকার পর্যন্ত করতে পারে। আপনি সেই ছোট থেকেই কল্পবিজ্ঞানীদের মিথ্যাচার শুনে-পড়েই বড়ো হয়েছেন। যার জন্য আপনি ভাববেন "সেই দূরে....র আকাশ থেকে কিভাবে বৃষ্টির জল মহাকাশের মধ্যে দিয়ে এসে পৃথিবীতে পড়ে!" মেনস্ট্রিম হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলজিতে আপনি এগুলো মিলাতে পারবেন না। তার কারণ সেগুলো সব বানোয়াট। সত্য সেটাই যা রহমান আমাদের স্পষ্ট বলে দিয়েছেন - পৃথিবী সমতল, আকাশ তার ছাদ।

প্রয়োজনে আপনি এটাকে আপনার ঘরের মেঝে ও ছাদের সাথে তুলনা করতে পারেন।

৯) আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উভয় ফুঁৎকারের মাঝে (ব্যবধান) চল্লিশ হবে। সাহাবাগণ বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ! চল্লিশ দিন (ব্যবধান)? তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে সন্দিহান। তারা আবারো প্রশ্ন করলেন, এ কি চল্লিশ মাস? এবারো তিনি বললেন, এ সন্দেহ পোষণ করি। তারা আবারও বলল, তা কি চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি তা বলি না। তারপর আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হবে, এতে মানুষ উদগত হবে যেমন উদ্ভিদ উদগত হয়। এরপর তিনি বললেন, একটি হাড় ছাড়া মানুষের সকল শরীর পচে যাবে। আর সে হাড়টি হলো, মেরুদণ্ডের হাড়। কিয়ামতের দিন এ হাড় হতেই পুনরায় মানুষকে পুনঃসৃষ্ট করা হবে।

[সহীহ মুসলিম ২৯৫৫]

অতএব এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান থেকেই বর্ষণ করেন। এই বিষয়টি কাফিরদের সমস্ত কুফরি বিকল্প তত্ত্বগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করে। এ আসমান থেকে পানি নাযিলের বিষয়টি আকিদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ১৪০০ বছর আগের মুশরিকরাও বিশ্বাস করত যে আল্লাহই আসমান থেকে পানি নাযিল করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

❝আর তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, ‘কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন’ ? তবে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’ । বল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর’ । কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না।❞ [২৯:৬৩]

সুতরাং, কুফফাররা আর্টিফিশিয়াল বৃষ্টি ঘটানোর যত চেষ্টাই করুক না কেন, এই বৃষ্টি আর আল্লাহর ভাণ্ডারের পবিত্র বারি এক নয়, কাফিরদের অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন দ্বারা তৈরি জলীয়বাষ্প মৃতভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ এটা শুধুই নিষ্প্রাণ তাৎপর্যহীন পানির নিম্নমুখী ধারা।
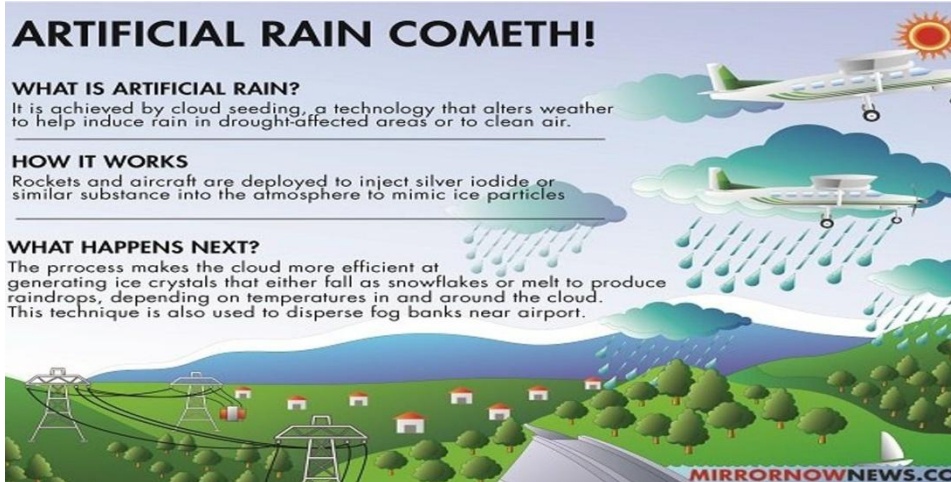
বৃষ্টি কোন অঞ্চলে খেয়ালখুশি মত হয় না (যেটা অপবিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, কারন তাদের মতে বৃষ্টি ঐশ্বরিক কর্তৃত্বহীন প্রাকৃতিক ঘটনা), বরং সরাসরি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ঘটে। নিম্নোলিখিত হাদিসে সেটা সুস্পষ্ট:

আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক লোক কোন এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ মেঘের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সাথে সাথে ঐ মেঘখণ্ডটি একদিকে সরে যেতে লাগল। এরপর এক প্রস্তরময় ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হল। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুগমন করে চলল। চলার পথে সে এক লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল যিনি কোদাল দিয়ে পানি বাগানে সবদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ দেখে সে তাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক, যা তিনি মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জানতে চাইলে কেন? উত্তরে সে বলল, যে মেঘের এ পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। এরপর বলল, তুমি এ বাগানের ব্যাপারে কি করো? মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ তাই বলছি, প্রথমে আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফসলের হিসাব করি। অতঃপর এর এক তৃতীয়াংশ সাদাকা করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পবিবার-পরিজনের জন্য রাখি এবং এক তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে খরচ করি।

[মুসলিম ২৯৮৪]

ফেরেশতারা মেঘ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। হযরত মিকাঈল (আঃ) মেঘ-বৃষ্টির দায়িত্বে আছেন। ফেরেশতাগন মেঘমালাকে আল্লাহর নির্দেশিত জনপদের হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞান আমাদের আজ বলে মেঘ র‍্যান্ডমভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মেঘগুলোই বৃষ্টি আকারে নেমে আসে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে মেঘগুলো আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোথাও যায় না। সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থণার পরপর মেঘ আবির্ভূত হয়ে বৃষ্টিপাতের ঘটনা হাদিসে এসেছে:

আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় কোন এক জুমু 'আহর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দু 'আ করুন। তিনি দু' হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাত আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দু 'আ শেষে) তিনি দু' হাত (এখনও) নামান নি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খন্ড উঠে আসল। অতঃপর তিনি মিম্বার হতে নীচে নামেননি, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর দাড়ির উপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ক্রমাগত দু' দিন এবং পরবর্তী জুমু 'আহ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। (পরবর্তী জুমু 'আহর দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ি ঘর ধ্বসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু 'আ করুন। তখন তিনি দু' হাত তুললেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ্ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু 'আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খন্ডের দিকে ইশারা করছিলেন, আর সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মদিনার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে এবং কানাত উপত্যকার পানি একমাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগল, তখন (মদিনার) চারপাশের যে কোন অঞ্চল হতে যে কেউ এসেছে, সে এ প্রবল বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।

[বুখারী ৯৩৩]

বজ্রধ্বনি:-

১) ইবনু আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আবূল কাসিম! আমাদেরকে রা’ দ (মেঘের গর্জন) প্রসঙ্গে বলুন, এটা কি? তিনি বললেনঃ মেঘমালাকে হাকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছে। তার সাথে রয়েছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করেন, যেদিকে আল্লাহ তা’ আলা চান। তারা বলল, আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তার তাৎপর্য কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাকডাক। এভাবে হাকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যায়। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। *[তিরমিযী ৩১১৭, সহীহ]*

২) ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বজ্রধ্বনি শুনতে পেলে বলতেনঃ “মহাপবিত্র সেই সত্তা বজ্রধ্বনি যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলো” । তিনি বলেন, বজ্রধ্বনিকারী হলেন একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যেমন রাখাল তার মেষপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

[আল আদাবুল মুফরাদ ৭২৭]

আলোর গতি শব্দের চেয়ে বেশি হয় যার জন্য আলো আগে আসে পড়ে শব্দ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এত কিছু জানবার পরেও একদল লোক থাকবেই, যারা রহমানের কালামের সরল অর্থ এবং সমগ্র দলীলের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে কাফিরদের কল্পনা, অভিশপ্ত শয়তানের কথা ও কম্পিউটারে বানানো ইমেজ/এনিমেশনে বিশ্বাস করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। বিভ্রান্তি এবং ফিতনা সেখান থেকেই হয় যেখানে শারঈ দলীলের তুলনায় আকল আর নফসকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আরবে গ্রীক এস্ট্রোনমি পৌঁছানোর পরবর্তীতে 'আলিমদের মধ্যে যারাই জ্যোতির্বিদদের সাথে ইসলামিক সৃষ্টিব্যবস্থাকে মেলাতে গেছেন তাদেরকে দেখবেন বিনা দলিলে নিজের যুক্তিনির্ভর আকলকে প্রাধান্য দিয়ে নসের বিপরীতার্থক অর্থকে নিয়ে ভিন্ন মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন, এমনকি ইজমায় রূপায়ন

পর্যন্ত করেছেন। ইবনে হাজমসহ আরও অনেকে বলেন যে আসমান গোল বলের ন্যায়! তাঁদের দলিল-

كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

❝সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে {فَلَكٍ} বিচরণ করে।❞ [২১:৩৩]

অর্থাৎ তাঁরা ফালাকের কথা উল্লেখ পেয়ে আসমানের বর্তুলাকারের কল্পনা করেছেন। সেটাকেই প্রাধান্য এবং প্রচার করেছেন। তাদের কয়েকজন একই কাজ পৃথিবীর ক্ষেত্রেও করেছেন।

আমরা আহলুস সুন্নাহর প্রত্যেক ইমামকেই ভালোবাসি,তাদের প্রতি সুধারণা রাখি।

অথচ অন্যদিকে কাতাদা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুয়াবিয়্যাহ (রাঃ) প্রমুখ জমহূর আলিম উলামাগন আসমানকে বলেছেন যমীনের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ। একই কথা পাওয়া যায় একাধিক সাহাবীদের (রাঃ) থেকে। এমতাবস্থায় আমরা তাঁদের দিকেই প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করি।

তারকা:-

মহান আল্লাহ বলেন:

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَاؕ وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَ حِفْظًاؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

❝অত:পর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু’ দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা।❞ [৪১:১২]

তারকা সম্পর্কে অন্য আরেক আয়াতে এসছে:

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ

❝নিশ্চয় আমি কাছের আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।❞ [৩৭:৬]

সুতরাং, কল্পবিজ্ঞানপন্থীদের আরেক মিথ্যা দাবী হচ্ছে, বিলিয়ন ট্রিলিয়ন (কাল্পনিক) গ্রহ-নক্ষত্র কাল্পনিক সীমাহীন মহাশূন্যের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আর সেগুলোর মাঝে কোনো এক ছোট্ট গ্রহে আমাদের অবস্থান।

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সমস্ত তারকা দ্বারা শুধু প্রথম আসমানকে সুশোভিত করেছেন। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী স্পষ্ট হয় তারকারা শুধুই নিকটবর্তী কাছের আসমানে। আমরা রাতের আসমানে মিটমিট করে যাদের জ্বলতে দেখি, তাদের সবাই প্রথম আসমানের নক্ষত্র। নক্ষত্র নানা রকমের হয়ে থাকে। গ্রহ বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলোও আসলে আকাশের সেই একটা তারকাদের অন্তর্ভুক্ত।

টেলিস্কোপে জুম করা গ্রহ বা তারকাদের চিত্র:
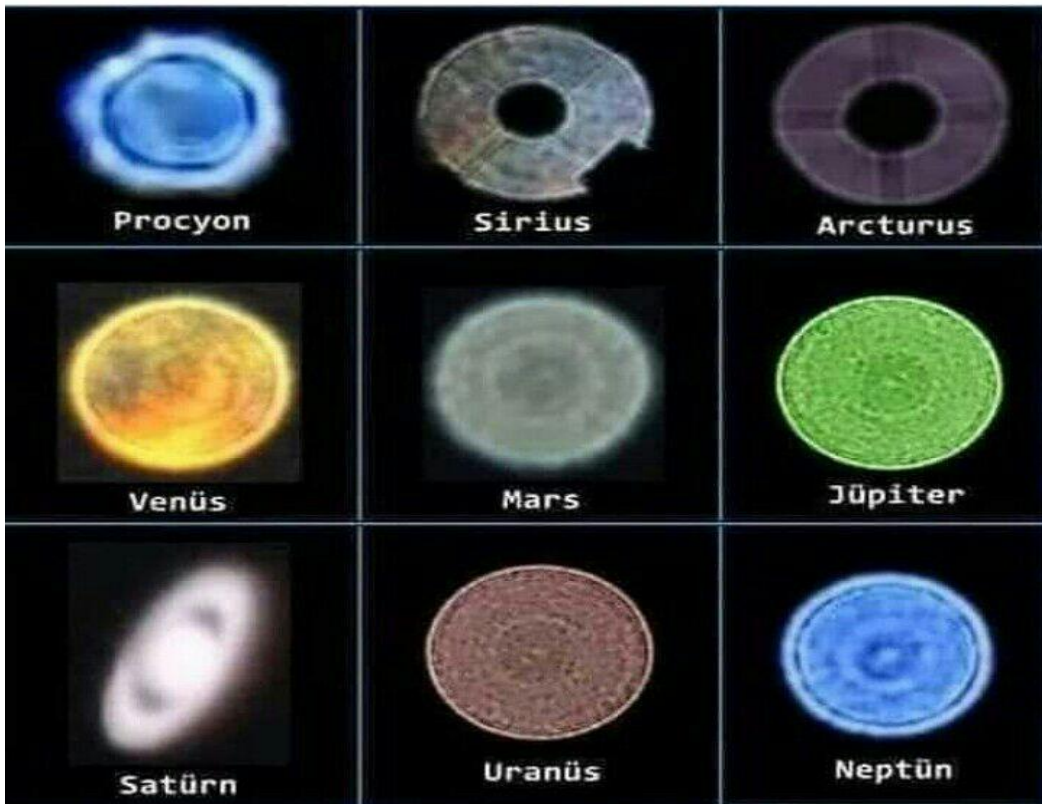
তাই পৃথিবীকে গ্রহ বলা একটা ভুল সিদ্ধান্ত। আর আগের অধ্যায় "চাঁদ ও সূর্য" পড়া থাকলে হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে সূর্য মোটেও কোনো নক্ষত্র বা তারকা নয়, যেমনটা মহাকাশবিজ্ঞান শিখিয়ে আসছে।

তারকা মহান আল্লাহর ভিন্ন সৃষ্টি।
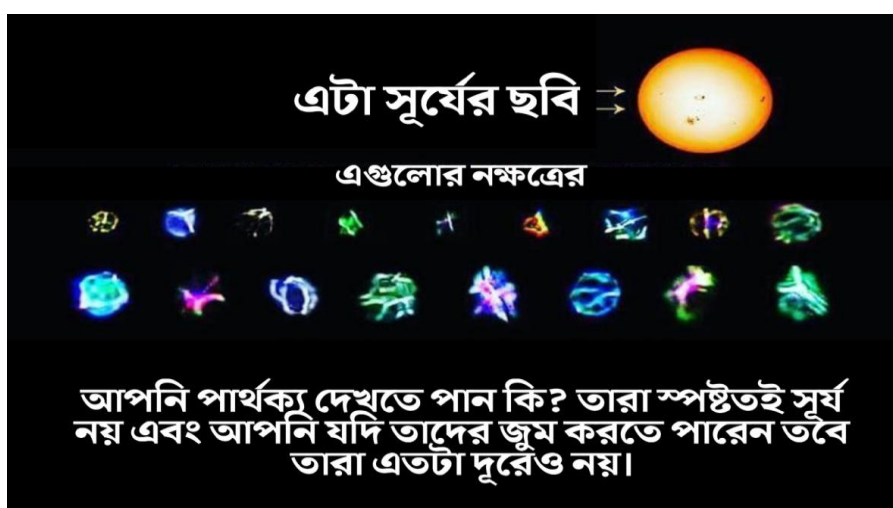
মহান আল্লাহ বলেন:

وَ هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ النُّجُوۡمَ لِتَهۡتَدُوۡا بِهَا فِیۡ ظُلُمٰتِ الۡبَرِّ وَ الۡبَحۡرِ ؕ قَدۡ فَصَّلۡنَا الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ

❝আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যেন তা দ্বারা তোমরা স্থলের ও সাগরের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও। অবশ্যই আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি।❞ [৬:৯৭]

তিনি অন্যত্রে বলেন:

اِلَّا مَنِ اسۡتَرَقَ السَّمۡعَ فَاَتۡبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِیۡنٌ

❝তবে যে গোপনে শোনে, তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়।❞ [১৫:১৮]

তিনি অন্যত্রে বলেন:

وَ لَقَدۡ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡیَا بِمَصَابِیۡحَ وَ جَعَلۡنٰهَا رُجُوۡمًا لِّلشَّیٰطِیۡنِ وَ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ السَّعِیۡرِ

❝আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।❞ [৬৭:৫]

এ সম্পর্কে কাতাদা রঃ বলেন, এ সব নক্ষত্ররাজি তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১) বানিয়েছেন এদের আসমানের সৌন্দর্য (২) শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করার জন্য (৩) এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন হিসেবে। অতএব যে ব্যক্তি এদের সম্পর্কে এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয় সে ভুল করে, নিক প্রাপ্য হারায় এবং সে এমন বিষয়ে কষ্ট করে যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই। *[বুখারী ২৯৭২]*

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে যে জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা রয়েছে যাতে আগামীর অবস্থাসমূহ, মানুষের জীবন অথবা বিশ্বপরিচালনার উপর তারকারাজির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আছে বলে দাবী করা হয়, তার সবই ভিত্তিহীন এবং শরীয়তের পরিপন্থীও।

হাদীসে এই জ্যোতির্বিদ্যাকে যাদুরই একটি অংশ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

❝ যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর জ্ঞান শিক্ষা করলো সে যাদু বিদ্যার একটা শাখা শিক্ষা করলো। তা যতো বৃদ্ধি পাবে যাদুবিদ্যাও ততো বাড়বে। ❞

[সহীহ, আবুদাউদ]

উল্কাপাত:-

১) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ ইসলাম-পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তারা বললেনঃ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধরণের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেনঃ এটা অর্থহীন ধারণা। কারো জন্ম-মৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়। *[মুসলিমঃ ২২২৯]*

২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “মাঝে মাঝে ফিরিশতারা আকাশের নীচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আসমানের সংবাদাদী নিয়ে পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত এবং গণকদের কাছে তা গোপনে পৌছিয়ে দিত। গণকরা এগুলোর সাথে শত মিথ্যা নিজেদের পক্ষ থেকে জুড়ে দিয়ে তা বলে বেড়ায়।” *[বুখারীঃ ৩২১০, ২২২৮]* পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ যখন আসমানে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতাগণ তার নির্দেশের আনুগত্য স্বরূপ তাদের ডানাগুলোকে মারতে থাকে তাতে পাথরের উপর জিঞ্জির পড়ার মত শব্দ অনুভূত হয়। তারপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর হয় তখন তারা বলতে থাকেঃ তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তারাই আবার বলেঃ হক্ক বলেছেন, তিনি বড়, মহান। কান লাগিয়ে কথাচোরগণ এ কথোপকথন শুনতে পায়। আর এসব কান লাগিয়ে শ্রবণকারীগণ একটির উপর একটি থাকে। বর্ণনাকারী সুফিয়ান তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। তিনি

তার ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করলেন এবং একটির উপর আর একটি স্থাপন করলেন। তারপর কখনো কখনো উজ্জল আলোর শিখা সে কান লাগিয়ে শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে কথা পৌছানোর পূর্বেই আঘাতে করে জালিয়ে দেয়। আবার কখনো কখনো আলোর শিখা তার কাছে পৌঁছার আগেই সে তার নীচের সাথীকে তা পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে পৌছাতে পৌছাতে যমীন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তারপর যাদুকর বা গণকের মুখে রেখে দেয়। তখন সে যাদুকর তথা গণক সে সংবাদের সাথে শতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে বর্ণনা করে। আর এভাবেই তার কোন কোন কথা সত্যে পরিণত হয়। তারপর লোকেরা বলতে থাকেঃ সে কি আমাদেরকে বলেনি যে, অমুক অমুক দিন এই সেই হবে, তারপর আমরা কি সঠিক পাইনি? আসলে সেটা ছিল ঐ বাক্য যা আসমান থেকে শোনা গিয়েছিল। *[বুখারীঃ ৪৭০১]*

[তাফসীরে জাকারিয়া, ১৫:১৮ আয়াতের তাফসীর]

৩) নক্ষত্রগুলির শেষ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ اِذَا الۡکَوَاکِبُ انۡتَثَرَتۡ

❝ যখন নক্ষত্রমন্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে ❞ [৮২:২]

সুতরাং, এগুলো প্রথম আসমানেই রয়েছে যা কিয়ামতের দিন ঝরে পড়বে, তাঁদের কথা মিথ্যা যারা বলেছে - তারকাগুলো পৃথিবীর চারপাশে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

আল্লাহু আ'লাম।

১০. পবিত্র কুরআন কি বলে পৃথিবী গোল ও গতিশীল? (সংশয় নিরসন)

এই অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় যাঁরা পবিত্র কুরআনের আয়াতকে সামনে এনে নিজ যুক্তির মাধ্যমে জোড়াতালি লাগিয়ে গোল ও গতিশীল পৃথিবীর দলীল দেয়, তাঁদের যুক্তিগুলোর অসারতা তুলে ধরা। এবং এটা দেখানো যে পবিত্র কুরআনে, এমনকি সুন্নাহতেও আপনি এমন কিছুই পাবেন না যেটা বলছে পৃথিবী গোল ও গতিশীল। বরং এর বিপরীতটাই বলে যার একাধিক দলীল ইতিমধ্যেই দেখেছেন।

গোলাকার পৃথিবী সত্যায়নে যেসব যুক্তিগুলো আনা হয়:-

১) সুরা নাজিয়াত: ৩০

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا

❝ এবং তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। ❞ [৭৯:৩০]

আফসোসের বিষয় যে আয়াত দ্বারা রহমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জমিনকে বিস্তৃত ও সমতলভাবে বিছানোর কথা বলেন, কাফিরদের মতাদর্শের সাথে মিল রাখার জন্য এই আয়াতকেই আজকের অনেক মুসলিম ভাইয়েরা ব্যবহার করে। তারা কাল্পনিক "গোলাকার" পৃথিবীর দলিলরূপে আন নাযিয়াতের ৩০ নং আয়াতকে ব্যবহার করে। তারা দাহাহা {دَحَاهَا} শব্দটির অর্থ বিকৃত করে বলে "উটপাখির ডিমের মতো করেছেন"

বিংশ শতাব্দীতে এসে এই ডিম্বতত্ত্বটির উৎপত্তি ঘটায় মিশরের রাশাদ খলিফা নামের এক নবী দাবিদার। এরপর জাকির নায়েকের মাধ্যমে এটার ব্যাপক প্রচার ঘটে।

The only "official" translation of the Qur'an that so far picked up on this "meaning", is the one completed in 1989 by Dr. Rashad Khalifa who is called by the title "God's messenger of the Covenant" by his followers, but otherwise generally considered a heretic by orthodox Muslims. The footnote to 79:30 states: *The Arabic "dahhaahaa" is derived from "Dahhyah" which means "egg."* The copy in my possession is the revised edition of 1992.

"দাহাহা" শব্দটির অর্থ বিস্তৃত করা। "দাহাহা" শব্দটির দূরবর্তী শব্দের অর্থটিকেও যদি গ্রহন করা হয় তবে এর দ্বারা বোঝায় উটপাখি ডিমপাড়ার জন্য অসমতল ভূমি পা দিয়ে আঁচড়ে যেভাবে বিস্তৃত করে ঐরূপ। এর সাথে ডিমের কোন সম্পর্ক নেই। উটপাখির এই কাজটিকেও যদি আয়াতের অর্থের সাথে সংযোগ করা হয়, তবে অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবী বিস্তৃত সমতল!

دحو

1. دَحَا, (Ṣ, Mṣb, Ḳ,) first pers. دَحَوْتُ, (Ṣ,) aor. يَدْحُو, (Mṣb, Ḳ,) inf. n. دَحْوٌ, (Ṣ, Mṣb, Ḳ,) *He spread; spread out, or forth; expanded; or extended;* (Ṣ, Mṣb, Ḳ;) a thing; (Ṣ;) and, when said of God, the earth; (Fr, Ṣ, Mṣb, Ḳ;) as also دَحَى, (Mṣb, Ḳ,) first pers. دَحَيْتُ, (Ḳ in art. دحى,) aor. يَدْحَى, inf. n. دَحْىٌ: (Mṣb, and Ḳ in art. دحى:) or *He* (God) *made* the earth *wide, or ample;* as explained by an Arab woman of the desert to Sh: (TA:) also, said of an ostrich, (Ṣ, TA,) *he expanded, and made wide,* (TA,) with his foot, or leg, the place where he was about to deposit his eggs: (Ṣ,* TA:) and, said of a man, *he spread, &c., and made plain,*

তাফসীরে তাবারি (৩১০হি):

অতঃপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। কেননা আহলে আরবদের পরিভাষায় مد ও دحو শব্দের অর্থ হলো بسط বা বিস্তৃত। যেমন উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সাল্তের কবিতায় দেখা যায়।

* বিশর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: ইয়াযীদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: সাঈদ আমাদের কাছে কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন: "এবং তিনি এরপরে পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।" এর অর্থ: "তিনি এটিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন {أَيْ بَسَطَهَا} (বা এটিকে সমতল করেছেন)।"

"পৃথিবী সমতল" অধ্যায়ে এই সম্পর্কে সালাফদের থেকে একাধিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, এই আয়াত গোল পৃথিবীর দলীল নয়। বরং এই আয়াত সমতল পৃথিবীর পক্ষেই একটা দলীল।

এখন ধরেন তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য উটপাখির ডিমতত্ত্বটা মেনেই নিলাম। এবার ভাবুন তো, তারা যে CGI কার্টুনছবি সত্যায়ণের জন্য শব্দার্থের বিকৃতি ঘটিয়ে উটপাখির ডিম বানালো, সেই CGI

কার্টুনছবিটি কি আদৌ উটপাখির ডিমের মতো দেখতে নাকি গোল ফুটবলের মতো!?

<u>২) সূরা যুমার: ৫</u>

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ

❝তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা..❞ [৩৯:৫]

গোল সমর্থনকারীরা এই আয়াতটিকে নিয়ে গোল পৃথিবীর প্রমাণ হিসেবে দেখাতে চান। তাঁরা বলেন, আয়াতের {يُكَوِّرُ} - শব্দটির অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেওয়া। তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহ দিনের উপর রাতকে পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে দেন। আর পৃথিবী গোলাকার হলেই কেবল এভাবে পেঁচানো বা জড়ানো সম্ভব। অতএব, পৃথিবী গোলাকার।

জবাব:

আসলে যাঁরা উপরের এই যুক্তি দেখিয়ে পৃথিবীকে গোল বলতে চায়, তাঁদের ধারণা যে

সমতল পৃথিবীর ওপর দিন রাত্রির জড়ানো বা পেঁচানো সম্ভব নয়। তাই এরূপ কথা বলে থাকেন। এই আয়াত পৃথিবীকে গোলাকার বলে না। আসলে এখানে বুঝার ভুল রয়েছে তাঁদের। সমতল পৃথিবীর ওপর দিন রাত্রির জড়ানো বা পেঁচানোটা যে অসম্ভব ব্যাপারটাতো এমন না। মহান আল্লাহ সমতল পৃথিবীর উপরেই রাত-দিনের পালাবদল ঘটান, দিনকে রাত দ্বারা ঢেকে দেন বা পেঁচিয়ে দেন দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। দিন রাতের প্যাঁচানোর বা জড়ানোর জন্য পৃথিবীকে গোলাকার হওয়া আবশ্যক নয়।

যে যুক্তি লাগিয়ে তাঁরা গোল প্রমাণ করে সেই যুক্তি সমতল পৃথিবীর ওপরেও খাটে।

নীচের ভিডিওটি দেখে আসুন কিভাবে সমতল পৃথিবীর ওপর দিন রাত্রির প্যাঁচানো বা জড়ানো হয়ে থাকে।

দেখুনঃ https://youtu.be/I0U3pZ-ge5w?feature=shared

আশা করি বোঝা গেছে যে এই আয়াত কোনোদিনই গোল পৃথিবীর দলীল নয়। তাঁরা এই রকমই আরেকটি আয়াত নিয়ে আসে, সেটা হলো:

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوۡلِجُ الَّيۡلَ فِى النَّهَارِ وَ يُوۡلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيۡلِ

❝আপনি কি দেখেন না, নিশ্চয় আল্লাহ রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান?❞ [৩১:২৯]

তাঁদের দাবি দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করানোটা পৃথিবীর গোল হওয়ার দলীল। এটা কোনো কথা হলো!? এগুলো সমতল পৃথিবীতেও সম্ভব সেটা তাঁরা বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝতে চায়না। আসলে ব্যাপারটা এরকম যে, সেই ছোটোকাল থেকেই প্রচলিত মিথ্যা শুনে শুনে আমরা বড়ো হয়েছি। ফলে গোলাকার পৃথিবীর কন্সেপ্টটা আমাদের মাথায় শক্তভাবে গেঁথে গেছে। যার জন্য গোলাকার পৃথিবীর বাইরে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা আমরা মোটেই করতেই পারিনা। সমতল আমাদের কাছে একটা আনএক্সেপ্টেবল বিষয় হয়ে উঠেছে। বস্তুত গোলের থেকে সমতল পৃথিবীতে দিন রাতের প্যাঁচানো বা জড়ানো, দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করা বিষয়গুলো বেশি স্পষ্ট বোঝা সম্ভব। সুতরাং, যেহেতু দিন রাতের প্যাঁচানো সমতলেও সম্ভব, তাই এটা বলা উচিত হবেনা এই আয়াতগুলো গোলাকার পৃথিবীর দলীল।

৩) সুরা রহমান: ৩৩

মহান আল্লাহ বলেন:

يٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ فَانۡفُذُوۡا

❝ হে জিন ও মানবজাতি, যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা থেকে বের হতে পার, তাহলে বের হও। ❞ [৫৫:৩৩]

আল্লাহ তা'আলা এখানে পৃথিবীর পরিসীমা পেরিয়ে যাওয়া বুঝাতে {اقطار} লাফয ব্যবহার করেছেন। {اقطار} হচ্ছে {قطر} এর جمع বা বহুবচন। অভিধান খুললে {قطر} এর মানে দিক, প্রান্ত, ভূখণ্ড, অঞ্চল, ব্যাস হিসেবে পাওয়া যায়। ব্যাস যেহেতু শুধু গোলক জিনিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অতএব পৃথিবী গোলাকার।
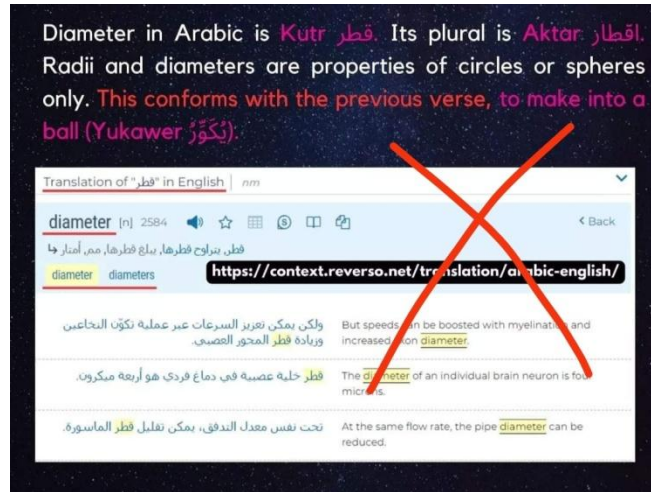
এইতো এই হলো তাঁদের অবস্থা। এরা কতটা কল্পবিজ্ঞানীদের কল্পকাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সেটা তাদের কথাবার্তায় বোঝা যায়।

এমন একটা শব্দ খুঁজে বের করলো যার সাথে পৃথিবীর আকারের কোনো সম্পর্কই নেই, তারপর সেই শব্দের দূরতম একটা সমার্থক শব্দ গ্রহণ করলো, তারপর সেই অর্থটা যেহেতু গোলকের জন্য প্রযোজ্য তাই পৃথিবী গোলক।

কী আজব একটা লজিক। পবিত্র কুরআনের একদম স্পষ্ট আয়াতগুলি যেগুলো আমি আগেই উল্লেখ করেছি সেগুলোকে তারা বলে "এগুলো সমগ্র পৃথিবীকে বোঝানো হয়নি বরং পৃথিবীর কিছুটা অংশকে" তারপর সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে এমন আয়াত নিয়ে এসে গোল প্রমাণ করতে চায় যার সাথে পৃথিবীর আকারের কোনো সম্পর্কই নেই।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ مِنۡهُ اٰیٰتٌ مُّحۡکَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡکِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَیۡغٌ فَیَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَۃِ وَ ابۡتِغَآءَ تَاۡوِیۡلِهٖ ۚۘ وَ مَا یَعۡلَمُ تَاۡوِیۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ؃ وَ الرّٰسِخُوۡنَ فِی الۡعِلۡمِ یَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ کُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا یَذَّکَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ

❝তিনিই তোমার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতিপয় আয়াত মৌলিক-সুস্পষ্ট অর্থবোধক, এগুলো হল কিতাবের মূল আর অন্যগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়; কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মূলত: এর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে যে, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে, মূলতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই নসীহত গ্রহণ করে না।❞ [৩:৭]

আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে, এই আয়াত পৃথিবীর গোল এমনটা বলছে না। তাঁরা এই পবিত্র আয়াতকে নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে গোলের দলীল হিসেবে দেখাতে চায়, স্পষ্ট আয়াতগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে। আল্লাহুল মুস্তা'আন।

৪) সূরা গাশিয়াহ:২০

কিন্তু কুরআনের কিছু সুস্পষ্ট আয়াত তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারেননি, যেগুলো সরাসরি পৃথিবী সমতল হওয়ার দলিল। তাই তারা সেসব আয়াতের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যেমন-

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

❝তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?❞

সুতিহাত {سُطِحَتْ} শব্দের অর্থ সমতল বা বিস্তৃত করা হয়েছে। এটাতে পৃথিবীর আকারের কথায় বলছে। কিন্তু তাঁদের বদ্ধমূল ধারণার সাথে না মিলার কারণে তাঁরা আয়াতের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করান।

তারা বলেন, "আয়াতের শুরুর দিকে বলা হয়েছে, 'তারা কি দেখে না?' এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ এখানে মানুষের দৃষ্টির প্রেক্ষিতে পৃথিবীকে সমতল বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ওটা গোলাকার। কারণ, একটা বিশাল আকারের গোলাকার বস্তুর পৃষ্ঠকে সমতলই দেখা যায়, এর বক্রতা একদমই চোখে পড়ে না।

<u>তাদের যুক্তি খন্ডন-</u>

-প্রথমত: তারা যদি পূর্বের আরো ৩টি নিদর্শনের ক্ষেত্রে একই ব্যাখ্যা গ্রহন করতে পারেন, তবেই পৃথিবীর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় না।

কারণ "তারা কি দেখে না" এটা শুধু পৃথিবীর ক্ষেত্রে বলা হয়নি বরং তার আগে উট,আকাশ ও পাহাড়ের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। দেখুন এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতগুলোর অর্থ কি দাঁড়ায়:

-মানুষের দৃষ্টিতে উট মাখলুক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাখলুক না.. বরং দেখতেই কেবল মাখলুকের মত লাগে।

-মানুষের দৃষ্টিতে আকাশ সুউচ্চ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুউচ্চ না.. দেখতেই কেবল উঁচু লাগে।

-মানুষের দৃষ্টিতে পাহাড়গুলো স্থাপিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্থাপিত না.. দেখতে স্থাপিত মনে হয়।

-মানুষের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমতল না.. দেখতেই কেবল সমতল মনে হয়।

আগের তিনটা আয়াতের এই ব্যাখ্যা করতে পারলে, তখনই কেবল পৃথিবীর ক্ষেত্রে তাদের একই ব্যাখ্যা গ্রহনযোগ্য হবে, অন্যথায় না। এই আয়াত পৃথিবী সমতলের কথায় বলছে, এবং তা অস্পষ্ট নয় বরং সুস্পষ্ট।

<u>৫) সূরা ইনশিকাক: ৩</u>

মহান আল্লাহ বলেন:

وَ اِذَا الۡاَرۡضُ مُدَّتۡ

❝আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে।❞ [৮৪:৩]

[উল্লেখ্য যে, এটা কিয়ামতের দিন সম্পর্কীয় আয়াত]

{مُدَّتْ} - এর অর্থ টেনে লম্বা করা, ছড়িয়ে দেয়া। এই আয়াত নিয়েও অনেকে গোলাকার সত্যায়নের চেষ্টা চালায়। তাদের যুক্তি - *"পৃথিবী এখন গোলাকার এবং কিয়ামতের দিনে এটাকে আল্লাহ সম্প্রসারিত করে সমতল করে দিবেন। যদি পৃথিবী এখন সমতলই হয় তাহলে সেটাকে আবার সমতল করবেন কিভাবে ! এ কথার তো কোনো মানে হয়না। অতএব পৃথিবী বর্তমানে গোলাকার রয়েছে।"*

এই ছিল তাঁদের মনগড়া যুক্তি। খেয়াল করুন সব সমতল কিন্তু একরকম হয়না। বর্তমানে পৃথিবীতে সাগর,পাহাড়,মালভূমি, ঘরবাড়ি,জঙ্গল হাজারো রকমের এবরো খেবড়ো জায়গা নিয়ে সব মিলিয়ে একত্রে সমতল অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের সেই সময় মহান আল্লাহ সব কিছুকে ধ্বংস করে যমীনকে একেবারে লেবেল করে দিবেন।

তাফসীরে জাকারিয়া:

অর্থাৎ বিরাট জনগোষ্ঠীকে এক জায়গায় দাঁড় করাবার জন্য সমস্ত সাগর, নদী, জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, তথা উঁচু-নীচু সব জায়গা ভেঙ্গে-চুরে ভরাট করে সারা দুনিয়াটাকে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরিণত করা হবে।*[দেখুন: ফাতহুল কাদীর; সা’ দী]*

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীকে লাল-শ্বেত মিশ্রিত এমন এক সমতল ভূমিতে একত্রিত করা হবে যেমন তা সাফাই করা আটার রুটির মতো। সে জমিনে কারো (ঘর বা ইমারতের) কোন চিহ্ন থাকবে না। *[বুখারী ও মুসলিম]*

ইবনু জারীর বলেন, ইবনু আবদুল আ'লা ইবনু সাওর 'মা'মার আয-যুহরী (আলী ইবনুল হুসায়ন বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আলাহ তাআলা পৃথিবীকে চামড়ার ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করবেন। তখন মানুষ মাত্র দু'পায়ে দাঁড়াবার জায়গা পাবে মাত্র।...." *[ইবনে কাসীর]*

অতএব আশা করি বুঝতে পারলেন যে এখনকার সমতল আর সেই সময়ের সমতল এক না। আর এই আয়াত গোল পৃথিবীর দলীল না।

৬) যারা গোলাকার সমর্থনে যুক্তি দেখায় এবার আমি হুবহু তাদের যুক্তিগুলো এখানে কপি পেস্ট করবো, তারপর তাদের যুক্তির দুর্বলতা তুলে ধরবো -

মহান আল্লাহ বলেন:

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

❝"তিনি দুই পূর্বের প্রভু, আর দুই পশ্চিমেরও প্রভু।❞ [৫৫:১৭]

এই আয়াতকে কিভাবে গোলের দলীল হিসেবে তুলে ধরছে দেখুন:

কুরআনে যদি পৃথিবীকে সমতলই বলা হত- তাহলে দুইবার পূর্ব আর দুইবার পশ্চিমের কথা বলা হল কেন? পৃথিবী যদি সমতল হত তাহলে সমগ্র পৃথিবীতে সূর্যের উদয় ও অস্ত একবার করে হত। কিন্তু পৃথিবী গোলাকার হওয়ায় এমনটা হয় না। কারণ আপনি যখন দেখছেন সূর্য উঠছে, তখন আসলে অন্য জায়গায় সূর্য ডুবছে। আর যখন দেখছেন সূর্য ডুবছে, তখন আসলে অন্য অবস্থানে সূর্য উঠছে (প্রকৃতপক্ষে সূর্য অস্ত বা উদয় কোনোটাই হয় না। বুঝানোর সুবিধার্থে এভাবে বললাম)। মোট দুইটা পূর্ব, দুইটা পশ্চিম। বিষয়টা আসলে আরও অনেক গভীর এবং আলোচনার বিষয়। জায়গার অভাবে এই মুহূর্তে সেদিকে আর যাচ্ছি না।

ওঁরা যে কথাটা বলছে- সমতল হলে পৃথিবীতে সূর্যের উদয় একবার করে হতো। আসলে তাঁরা ভেবেছেন যে সূর্য বুঝি পৃথিবীর তুলনায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। তার জন্যই এরূপ মন্তব্য করেছেন। বাস্তবতা হলো সূর্য পৃথিবীর থেকে অনে.....ক ছোট এবং পৃথিবীর কাছেই রয়েছে। এই সমতল পৃথিবীতে সূর্যের অস্ত যাওয়ার, উদয় হওয়া এগুলো সবই ঘটে। কিন্তু ওই যে বললাম না মাথাতে কল্পিত থিওরি গেঁথে আছে যার জন্য গোল থিওরি থেকে বেরিয়ে বাস্তবতার আলোকে কিছু চিন্তা করতেই পারিনা। সমতল পৃথিবীতে কেনো এক সাথে সূর্যদয় হয়না!? সূর্যদয় কীভাবে হয়!? এগুলো শেষ অধ্যায়টিতে পাবেন। সেটা পড়লে হয়তো অনেকে এই গোল বাউন্ডারি থেকে বের হয়ে বাস্তবতা চিনতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ।

পৃথিবীর ওপর সূর্যের অবস্থান দেখুন:

https://youtu.be/NNr-Y1AOrqc?feature=shared\

সুতরাং, যেহেতু সমতল পৃথিবীতেও সূর্যদয়-সূর্যাস্ত এগুলো সবই সম্ভব, তাই এইসব যুক্তি লাগিয়ে এই আয়াতকে গোলের দলীল বানানো উচিত নয়।

৭) গোল সমর্থনকারীদের আরেকটি যুক্তি নীচে হুবহু দেওয়া হলো:

মহান আল্লাহ বলেন:

❝আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে 'অর্ন্তদৃষ্টি-সম্পন্নগণের' জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে।❞ [২৪:৪৪]

❝নিশ্চয়ই মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং 'রাত ও দিনের আবর্তনে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে' জ্ঞানবান লোকদের জন্য।❞ [৩:১৯০]

আল্লাহ্ কেন বললেন অন্তর্দৃষ্টির কথা? কেন বললেন না বাহ্যিক দৃষ্টির কথা? আমরা বাহ্যিকভাবে দেখি, সূর্য উদিত হয় বা অস্ত যায়। আসলেই কি তাই? 'রাত ও দিনের আবর্তনে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে' কি এমন 'বিশেষ' জিনিস রয়েছে যাতে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিতে হবে? অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার আর পাগড়ির মত প্যাঁচানোর কথা বলে এখানে ইঙ্গিতে পৃথিবীর স্ফেরিক্যাল শেপ এবং ঘূর্ণায়মানতার কথা বলা হয়েছে।

দেখলেন তো তাঁদের দলীল। কতটা আজব। এই আয়াত কি সালাফগণ গোলের দলীল হিসেবে নিয়েছিলেন!? তারা এখানে যা বলতে চাইছে সেটার সারমর্ম হচ্ছে - বাহ্যিক দৃষ্টিতে পৃথিবীকে স্থির ও সমতল দেখলে সত্য বুঝা যাবেনা, দেখতে হবে অন্তর্দৃষ্টি। আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে পৃথিবী গোলাকার ও ঘুরছে ।

জবাব: তাঁদের আমি শুধু এইটুকুই বলতে চায়, যারা সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবে তারা পৃথিবীকে গতিহীন নিশ্চল ও সমতল- বিস্তৃতই দেখবে। আর বর্তমানে যারা গতিশীল ও গোলাকার দেখে তারা জানতে কিংবা অজান্তে অভিশপ্ত শয়তানের এজেন্ডা বাহক নাসা (NASA)-এর চোখে দেখে। এই আয়াত কখনোই গোলের দলীল নয়। সব মনগড়া আজব যুক্তি।
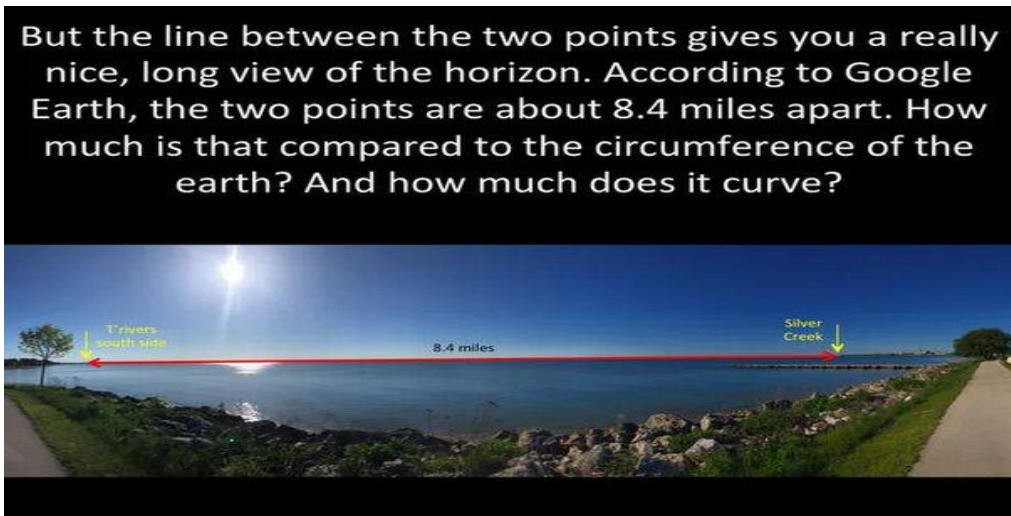
পৃথিবীর গতি সত্যায়নে যেসব যুক্তিগুলো আনা হয়:-

৮) মহান আল্লাহ বলেন:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

❝তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ; কিন্তু ওরা হবে মেঘপুঞ্জের মত চলমান।❞

[২৭: ৮৮]

এই আয়াত দেখিয়ে তাঁরা বলতে চায়, কুরআন আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্ব থেকে বলে আসছে পৃথিবী গতিশীল! অথচ এই আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। এর পূর্বের আয়াতটি দেখলেই ব্যাপারটি বুঝতে পারবেন:

❝যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আল্লাহ যাদের ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতবিহব্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর নিকট লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে।❞ [২৭:৮৭]

তারা পূর্বের আয়াতকে বিচ্ছিন্ন করে চলমান পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়ে বলছে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান! কি আজব ব্যাপার!

৯) মহান আল্লাহ বলেন:

لَا الشَّمۡسُ یَنۡۢبَغِیۡ لَهَاۤ اَنۡ تُدۡرِكَ الۡقَمَرَ وَ لَا الَّیۡلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَ كُلٌّ فِیۡ فَلَكٍ یَّسۡبَحُوۡنَ

❝সূর্যের পক্ষে চাঁদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, রাতও দিনকে অতিক্রম করতে পারে না এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।❞ [৩৬:৪০]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

"প্রত্যেকেই, অর্থাৎ সূর্য ও চাঁদ, দিন ও রাত প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।" [৩৬:৪০]

ইবনে আব্বাস (রাযি.), ইকরামা (রাহি:), দাহহাক (রাহি:), হাসান (রাহিঃ), কাতাদাহ (রাহিঃ), আতা আল-খুরাসানী (রাহি:) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এখানে বুঝতেই পারছেন, আয়াতে বলা হচ্ছে, চাঁদ-সূর্য ও রাত-দিন কক্ষপথে সন্তরণ করছে। তাঁরা "প্রত্যেকে" {كُلٌّ} শব্দের মধ্যে পৃথিবীকেও যুক্ত করে প্রমাণ করতে চায় যে পৃথিবী গতিশীল। অথচ এখানে পৃথিবীর কথা উল্লেখই করা হয়নি! এরকম একাধিক আয়াতে পবিত্র কুরআনে এসেছে, কোনোটাতেই "কুল্লুন" {كُلٌّ} শব্দ দ্বারা পৃথিবীকে বোঝানো হয়নি।

মহান আল্লাহ একাধিক আয়াতে বলেন:

(i) ❝ তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আর তিনিই সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করে দিয়েছেন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করছে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। ❞ [৩৫:১৩]

(ii) ❝ তিনি রাতকে দিনের উপর এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখ, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। ❞ [৩৯:৫]

(iii) ❝ তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান? আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই চলছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। ❞ [৩১:২৯]

নাস্তিক বিজ্ঞানীদের কোন থিউরি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হলেই বিজ্ঞানপ্রেমী কিছু লোক কুরআনের নতুন নতুন ব্যাখ্যা শুরু করে দেয়। উপরের কোনোটিতেই পৃথিবীর কথা বলা হয়নি অথচ প্রচলিত কুফরী মহাকাশবিজ্ঞানকে ইসলামের সাথে সমন্বয় করার ব্যর্থ চেষ্টায় অনেকেই বলেছেন যে এই আয়াত প্রমাণ করে পৃথিবী গতিশীল। অথচ পৃথিবীর কথা উক্ত কোনো আয়াতেই আসেনি। পবিত্র কুরআনের ও হাদীসে গতিশীলতার কোনো দলীল নেই। থাকবে কি করে পৃথিবী তো বাস্তবেও স্থির, এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। আর এই স্থিরের পক্ষেই একাধিক দলীল আছে যা আমি "পৃথিবী স্থির" অধ্যায়টিতে আগেই আলোচনা করেছি।

১০-) পৃথিবী স্থির হওয়ার আয়াতগুলো নিয়ে তাদের অপব্যাখ্যা:-

<u>সংশয় ১</u>- "আল্লাহ পৃথিবীকে স্থির করেছেন"-এর অপব্যাখ্যায় তারা বলে, আসলে পৃথিবী গতিশীল। কিন্তু তার গতিটা সুশৃঙ্খল হওয়ার কারণে আল্লাহ পৃথিবীকে স্থির বলেছেন!

<u>জবাব</u>-চাঁদ-সূর্য, রাত-দিনও তো সুশৃঙ্খলভাবে ভাবে ঘূর্ণায়মান। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ 'কারার' বা স্থির শব্দ ব্যবহার করেননি কেন? তাহলে কি সূর্য-চন্দ্রের গতি বিশৃংখল?

<u>সংশয় ২-</u> আবার অনেকে বলে, আল্লাহ পৃথিবীকে 'কারার' বানিয়েছেন। আর কারার শব্দের অর্থ শুধু স্থির না, এর আরেকটি অর্থ হলো বাসস্থান। আমরা বাসস্থান অর্থটিও গ্রহণ করতে পারি।

<u>জবাব</u>- একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। তো আপনি 'কারার' শব্দের অর্থ বাসস্থান নিলেও স্থির অর্থটা তো বাদ দিতে পারেন না। সালাফদের থেকে কোনটা প্রমাণিত সেটা দেখতে হবে।

<u>সংশয় ৩</u>- 'পাহাড় দ্বারা পৃথিবী স্থির করেছেন' এর অপব্যাখ্যায় তারা বলে, পৃথিবীর মাটি কয়েক স্তরে বিভক্ত। এতে কিছু প্লেট আছে, সেই প্লেটগুলোকে আটকিয়ে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাহাড়গুলো স্থাপন করেছেন। কিন্তু পৃথিবী এই পাহাড়গুলো নিয়ে মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান!

<u>জবাব</u>: এই তাফসীর সালাফদের কোন কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা কি বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সালাফদের স্পষ্ট তাফসীর বাদ দিয়ে নিজে থেকেই তাফসীর করা হলো না? সাহাবীরা রাঃ কি পৃথিবীর স্থির মানে পৃথিবীর প্লেটের স্থির থাকাকে মনে করতেন? নাকি এখানে স্পষ্ট পৃথিবীর স্থির থাকায় বোঝানো হয়েছে? যেমনটা ইমাম কুরতুবি রঃ (৬৭১হি.) বলেছেন,

"আহলে-কিতাব ও মুসলিমদের বক্তব্য হলো, পৃথিবী স্থির ও নিশ্চল। এটি কেবল ভূমিকম্পের সময় নড়ে *ওঠে।" [তাফসীর আল-কুরতুবী ৯/২৪৫]।*

আল-কুরআনের 'বৈজ্ঞানিক নিদর্শন' আবিষ্কারের নামে সালাফদের ব্যাখ্যা অবজ্ঞা করে অপবিজ্ঞানের থিউরির আলোকে তারা এভাবে বহু আয়াতের ব্যাখ্যা বিকৃত করছে। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ...

এছাড়াও গোল-গতিশীল সমর্থন করতে গিয়ে আমাদের ভালোবাসার পথনির্দেশক অনেক আলিমগণও এরকম মন্তব্য করে থাকেন। তাঁদের ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখি। সাগর পরিমাণ তাঁদের ইলম ও খিদমতের কাছে ভুল হওয়াটা বিরাট কিছু নয়। আল্লাহ তাঁদের ও আমাদেরকে মাফ করুন। আমাদের সকলকেই সহীহ বুঝ দান করুন।

১১. বৈজ্ঞানিক মোজেজার নামে পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা ও তার ভয়াবহতা

বর্তমানে একশ্রেণীর মুসলিম ভাই বের হয়েছে, যারা নাস্তিকদের বানোয়াট তত্ত্বগুলোকে চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস করে তার অনুকূলে কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। তারপর বলে, *"এটা তো ১৪০০ বছর পূর্বের নাজিলকৃত কুরআনে আছে!!!"*

তাদের মাঝে আর গোলাকার পৃথিবী সমর্থনকারী পূর্বেকার আলিমগণের মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য। এরা পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিটা থিউরি, হয়তো সেটা এখনো প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে বিবেচিত হয়নি কিংবা কল্পবিজ্ঞানীদের নিজদের মধ্যেই বিষয়টি বিতর্কিত তবুও সেটা সত্যায়নের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, তাঁরা কিভাবে কুরআনের আয়াত সমূহের অর্থ বিকৃতি করে।

১) মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব(বিগ ব্যাং) সত্যায়নে আয়াতের অপব্যাখ্যা:

(মহাবিস্ফোরণ ও সম্প্রসারণ তত্ত্ব: মহাবিশ্ব একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে অসীম মহাশূন্যে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে...)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اَوَ لَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰهُمَا ؕ وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ
حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ

❝যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবেনা?❞ [২১:৩০]

এখানে "আসমান-জমিন এক সঙ্গে মিলিত ছিলো, অতঃপর আমি পৃথক করলাম" আয়াতাংশ দ্বারা তারা নাস্তিক্যবাদী মহাবিস্ফোরণ(বিগ ব্যাং) থিউরি সত্যায়ন করে। আর বলে, *"কুরআন ১৪০০ বছর আগেই বিগব্যাং তত্ত্ব দেয়, যা আজ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হলো।"*

তবে তারা নিজেরাই সেটা আবিষ্কার করলো না কেন? নাস্তিকদের গবেষণা পত্রের দিকে এতদিন চেয়ে ছিলো কেন? নাস্তিকরা বস্তুবাদী বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন নতুন থিউরি বানিয়ে সৃষ্টি জগতকে বিকৃত করছে, আর এরা কুরআন-হাদীস বিকৃত করে সেগুলো সত্যায়ন করে যাচ্ছে!

দেখুন তাদের অপব্যাখ্যার সাথে প্রকৃত তাফসীরের কতটা পার্থক্য -

সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ❝আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন এর অর্থ হচ্ছেঃ আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিত ছিল তারপর আমরা সে দুটিকে পৃথকীকরণ করেছি। হাসান ও কাতাদা রাহেমাহুমাল্লাহ বলেনঃ এতদুভয়ের মধ্যে বাতাস দ্বারা পৃথকীকরণ করেছেন। *[ইবন কাসীর; কুরতুবী]*

আকাশ জমিন মিশে থাকা এবং তাদের পৃথক করা, আর একটা বিন্দু বিস্ফোরণের দ্বারা সৃষ্টিজগত তৈরি হওয়া (যেটাকে বিগব্যাং বলছে) - দুটোর মধ্যে কতটা পার্থক্য সেটা আর বললাম না, পাঠকরা ঠিকই বুঝে নিবে।

২) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ তত্ত্ব সত্যায়নে আয়াতের অপব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَ السَّمَآءَ بَنَيۡنٰهَا بِاَيۡىدٍ وَّ اِنَّا لَمُوۡسِعُوۡنَ

❝আর আসমান আমরা তা নির্মাণ করেছি আমাদের ক্ষমতা বলে এবং আমরা নিশ্চয়ই মহাসম্প্রসারণকারী।❞ [৫১:৪৭]

মূল আয়াতাংশ {مُوسِعُونَ} অর্থ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী এবং প্রশস্তকারী উভয়টিই হতে পারে। তাছাড়া {مُوسِعُونَ} শব্দের অন্য আরেকটি অর্থও কোন কোন মুফাসসির থেকে বর্ণিত আছে, তা হলো রিযিক সম্প্রসারণকারী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের রিযিকে প্রশস্তি প্রদানকারী। [দেখুন, কুরতুবী] তবে ইবন কাসীর রঃ প্রশস্তকারী অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি অর্থ করেছেন, “আমরা আকাশের প্রান্তদেশের সম্প্রসারণ করেছি এবং একে বিনা খুঁটিতে উপরে উঠিয়েছি, অবশেষে তা তার স্থানে অবস্থান করছে। *[ইবন কাসীর]*

'মূসিউন' মাধ্যমে তারা নাস্তিক্যবাদী মহাবিস্ফোরণ ও সম্প্রসারণ থিউরির দলিল দাঁড় করাতে চায়! অথচ কল্পবিজ্ঞানীরা এই বানোয়াট থিউরির মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায়, 'এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার কোন ভূমিকা নেই। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটে চার দিকে কণাগুলো ছড়িয়ে যায় আর সম্প্রসারণ হতে থাকে। এভাবেই উৎপত্তি হয় মহাবিশ্বের!' আর এরা পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা করে সেই কল্পবিজ্ঞানীদের জানান দিতে চায়, 'এই দেখো তোমাদের মহাবিস্ফোরণ ও সম্প্রসারণ তত্ত্ব আমাদের কুরআনে আরো ১৪০০ বছর আগে থেকেই আছে'..

৩) 'অভিকর্ষ বল' বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সত্যায়নে তাদের অপব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ كِفَاتًا اَحۡيَآءً وَّ اَمۡوَاتًا

❝আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে জীবিত ও মৃতদের জন্য?❞ [৭৭:২৫-২৬]

এখানে 'ধারণকারী' এর স্থলে 'আকর্ষণকারী' অর্থ করে তারা অভিকর্ষ তত্ত্ব সত্যায়ন করে!

ইবনে জারির তাবারি (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

"মুজাহিদ ও কাতাদা রঃ বলেন: জীবিত অবস্থায় জমিন তোমাদেরকে স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করেছে আর তোমাদের মৃত্যুর পরও নিজের পেটের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে।" *[তাফসীরে তাবারি]*

শাবি (রঃ) বলেন: "পৃথিবীর অভ্যন্তরীন ভাগ ধারণ করছে মৃতদেরকে আর উপরিভাগ ধারন করছে জীবিতদেরকে।"

তাফসীরে জাকারিয়া:

ভূমি জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে। (সা'দী; মুয়াস্‌সার)

এইভাবে তারা অপব্যাখ্যা করে গ্রাভিটি বা অভিকর্ষ নামক থিওরির সত্যায়নের চেষ্টা করে। অথচ সমতলে বিশ্বাসী অনেক গবেষকই এটাকে hoax বলে থাকেন। "ঘনত্ব ও প্লবতা"র নিয়ম দিয়ে বস্তুর নিচে পড়ার কারণ আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই থিওরি মূলত গ্লোবকে টিকিয়ে রাখার তাঁদের অস্ত্রস্বরুপ।

"Gravity" is bullshit.
Weight
Wood
Less Dense
than water
Buoyant
force
Weight
More Dense
than water
Steel
It's density and buoyancy!
Buoyant
force
www.reddit.com/r/LEVELMANIA
Less Dense
than lower air layer
Buoyant
force
More Dense
than lower air layer
Weight

GRAVITY HOAX
Millions of tons of water do not fall -
but apples do fall ???

এখানে শুধু জুম ইন করুন
এবং আমাদের এই দেখান
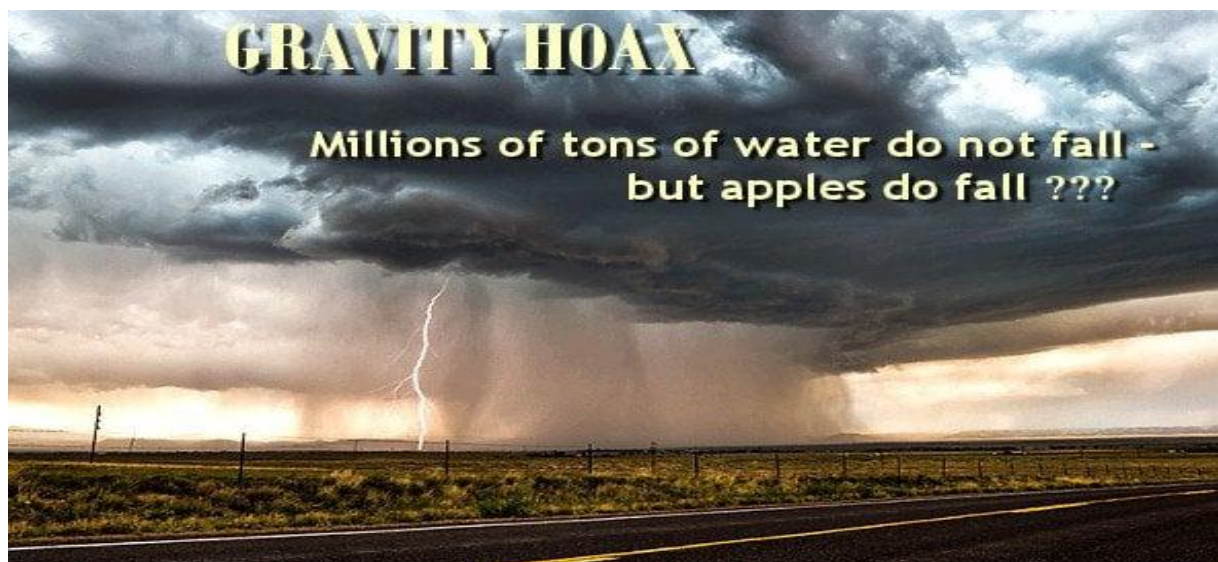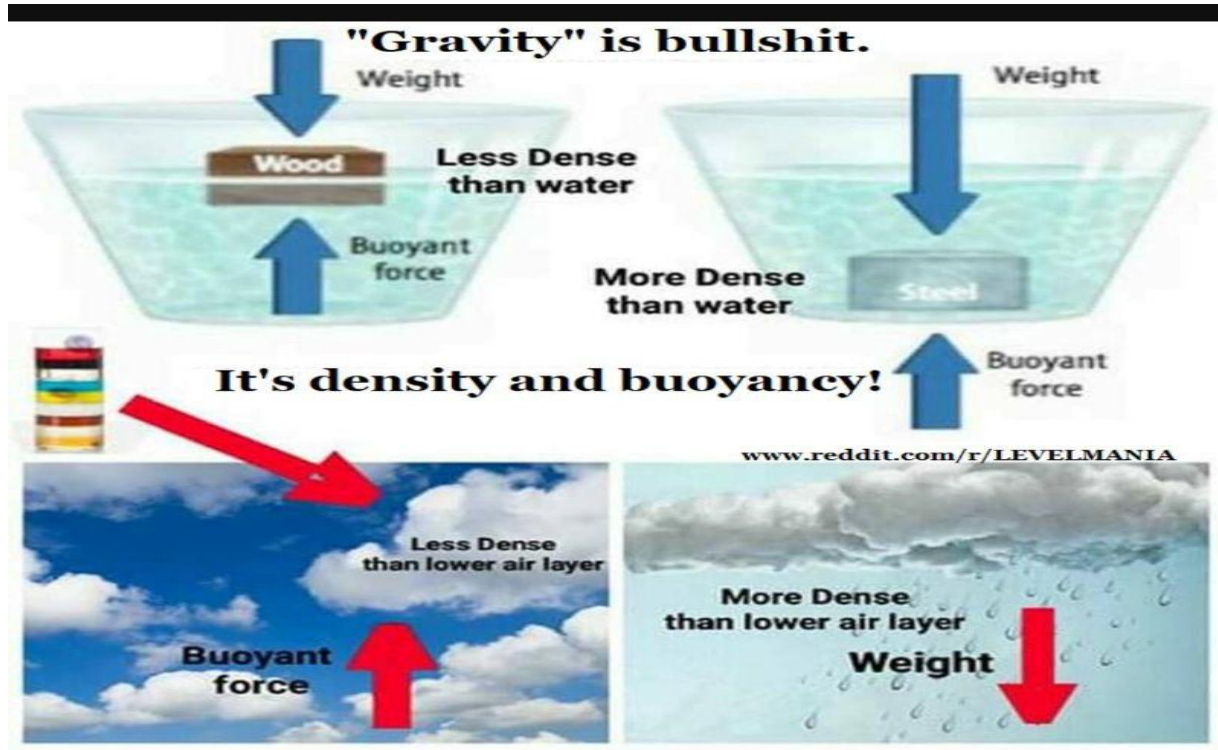
পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা হতে সাবধান:-

মহান আল্লাহ বলেন:

اِنَّ الَّذِيۡنَ يُلۡحِدُوۡنَ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخۡفَوۡنَ عَلَيۡنَا ؕ اَفَمَنۡ يُّلۡقٰى فِى النَّارِ خَيۡرٌ اَمۡ مَّنۡ يَّاۡتِىۡۤ اٰمِنًا يَّوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ

❝নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি উত্তম, না যে কিয়ামত দিবসে নিরাপদভাবে উপস্থিত হবে?❞ [৪১:৪০]

তাফসীরে আহসানুল বায়ান:

ইবনে আব্বাস রাঃ {إلحاد} এর অর্থ করেছেন, বিকৃত বা অপব্যাখ্যা করা। যার ভিত্তিতে এতে সেই ভ্রষ্ট দলগুলোও চলে আসে, যারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা ও মতবাদকে সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহর আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করে এবং তার অর্থে বিকৃতি সাধন ও হেরফেরও করে।

* সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের প্রবীণ সদস্য, যুগশ্রেষ্ঠ ফাকিহ আশ-শাইখুল আল্লামা ইমাম সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ বলেন:

❝তাই মেডিকেল থিওরী, আদর্শিক তত্ত্ব বা এরকম আরো যা আছে, এগুলো দিয়ে কুরআন ব্যাখ্যা করতে যাবেন না। এটা ভুল কাজ!❞

তিনি তাঁর বক্তব্যে তাফসীরের পাঁচটি সঠিক উৎস সম্পর্কে বলেন। দেখুনঃ https://youtu.be/GDJiJjgENqE?feature=shared

- তাফসিরের গুরুত্ব এবং এর সূত্র সম্পর্কে সালিহ বিন ফাওজান আল-ফাওজান হাফিজাহুল্লাহ বলেন:-

আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের ব্যাখ্যা চারটি মাধ্যমে করা হয়:

প্রথম: কুরআনের মাধ্যমেই কুরআনের ব্যাখ্যা করা। কারণ কুরআন প্রায়শই নিজের একটি অংশ অন্য অংশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে।

দ্বিতীয়: রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সুন্নাতের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করা, কারণ আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে মানুষের কাছে কুরআন ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

<u>তৃতীয়:</u> সাহাবীদের বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর ছাত্র ছিলেন এবং তারা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা ও অন্যান্য তথ্য গ্রহণ করতেন।

<u>চতুর্থ:</u> কুরআন যে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে তার মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা, কারণ আল্লাহ তা স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন।

এবং আলেমগণ কুরআন ব্যাখ্যা করার জন্য উত্তরসূরিদের (তাবিয়ূন) বক্তব্যকে উৎস হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়ে বিভিন্ন অবস্থানে রয়েছেন, যেহেতু তারা সাহাবীদের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু নিজের মতামত বা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে, এটি জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলার আওতায় পড়ে।

[তাক্বীবাত ওয়া মুলাহাছ্বাত আলা কিতাব সাফওয়াহ আত-তাফাসির, পৃষ্ঠা ৪৫]

দেখুনঃ

https://tulayhah.wordpress.com/2016/09/19/the-importance-of-tafsir-and-its-sources-sheikh-al-fawzan/

এখন তো অনেকে কুরআনের তাফসির করছে নাস্তিকদের কল্প-বিজ্ঞানের আলোকে। এমনকি ওদের সাথে কোনো কিছু সাংঘর্ষিক হলে কুরআনের ব্যাখ্যাকে ১৮০° ঘুরিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে পবিত্র কুরআনেই নাকি বলা হয়েছে তাদের ওসব কল্প-কাহিনী!!!

ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...

তার একটা দৃষ্টান্ত হলো সূরা নাযিআতের আয়াতটি:

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَٰهَا

❝ এবং তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। ❞ [৭৯:৩০]

পূর্বের সমস্ত আলিমগণ 'দাহাহা' শব্দের অর্থ করেছেন "বিস্তৃত করেছেন"। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অনেকে অর্থটাকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। তারা অর্থ করে "ডিম্বাকৃতি করেছেন"। কল্পবিজ্ঞানীরা গোল বলেছে তাই তাদের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে এই অর্থ বিকৃতি।

১২. কতিপয় সংশয় ও তার জবাব

গোলাকার মতবাদের উৎপত্তি থেকে শুরু করে সমতলের পক্ষে প্রমাণাদি, গোলাকার মতবাদের খন্ডনসহ আরো বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এরপরেও অনেকেরই নানা ধরনের সংশয় মনের ভেতর আসতে থাকে, তারই কিছু জবাব নীচে দেওয়া হলো:

প্রশ্ন: গোলকার মতের ওপর কি ইজমা রয়েছে?

জবাব: • সুনানে তিরমিযির বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযির' লেখক এবং একজন অগ্রগণ্য মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুর-রহমান মুবারকপুরী রাহিমাহুল্লাহ [মৃত: ১৩৫৩হিজরী] বলেন:

❝ যদি বলতে চান পৃথিবী গোলাকার যে, পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি থেকে শুরু করে সকল দ্বীনের ইমামগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলে একমত হয়েছেন এবং এতে বিশ্বাস করেছেন, তাহলে এটা একেবারেই মিথ্যা। ❞

٤٩٨

قَالَ أبو عيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .

١٢١ — بَابُ

مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

١٦١ — حدثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ حدثنا إسْمعيلُ بنُ عُلَيَّةَ عَنْ أيوبَ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أمِّ سَلَمَةَ أَنَّها قالَتْ « كَانَ رَسُولُ الله عليه وسلمَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً للظُّهْرِ مِنْكُمْ ، وأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلاً لِلعصر مِنْهُ .

تعديل الأركان فإن الشريعة عدت السجدات الثمانية الخالية عن الجلسة أربع سجدات وعن أبي حنيفة من ترك القومة أو الجلسة أخاف أن لا تجوز صلاته انتهى .

قلت : ومع هذا أكثر الأحناف ينقرون كنقر الديك ويتركون تعديل الأركان متعمدين ، بل إذا رأوا أحدا يعدل الأركان تعديلا حسنا فيظنون أنه ليس على المذهب الحنفي ، فهداهم الله تعالى إلى التعديل .

تنبيه آخر : قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: اعلم أن الأرض كروية اتفاقا فيكون طلوع الشمس وغروبها فى جميع الأوقات ، فقيل إن الشياطين كثيرة فيكون شيطان لبلد وشيطان آخر لبلدة أخرى وهكذا ، وعلى كروية الأرض تكون ليلة القدر مختلفة وكذلك يكون نزول الله تعالى أيضا متعددا وظنى أن سجدة الشمس بعد الغروب تحت العرش لا تكون متعددة بل تكون بعد دورة واحدة لا حين كل من الغوارب المختلفة بحسب تعدد البلاد انتهى .

قلت إن أراد بقوله أن الأرض كروية اتفاقا أن جميع أئمة الدين من السلف والخلف متفقون على كروية الأرض وقائلون بها فهذا باطل بلا مرية ، وإن أراد به اتفاق أهل الفلسفة وأهل الهيئة فهذا مما لا يلتفت إليه ، ثم ما فرع على كروية الأرض ففيه أنظار وخدشات فتفكر .

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى .

(باب ما جاء فى تأخير صلاة العصر)

قوله (وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه) قال الطيبى : ولعل هذا الإنكار عليهم

[تحفة الاحوذي على شرح سنن الترمذي]

• শাইখ আব্দুল করিম বলেছেন: তার শাইখ ফাহদ আল-উবাইদ বলেছেন যে, “ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং ইবনুল কাইয়্যিম থেকে পৃথিবীর গোলক সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা দ্বীনের মধ্যে একটি বিদ ‘আত এবং তাদের কিতাবে যা বলা হয়েছে তা তাদের থেকে তাদের বিরুদ্ধে বানোয়াট কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং, পৃথিবী সমতল, গোলাকার নয়, যেমনটি আল-সুয়ুতি উল্লেখ করেছেন।”

[الكتاب: معجم أسر بريدة

المؤلف: محمد بن ناصر العبودي]

সোর্সঃ https://shamela.ws/book/147374

সোর্সঃ https://ketabonline.com/ar/books/97091/read?part=4&page=2245&index=1779653/1779794/1779806 [পৃষ্ঠা নং ৫৬৫]

মূলত গোলকার মতবাদটি আসে দার্শনিকদের থেকে যেটা ইমাম কাহতানি রঃ (৩৮৭হি.) উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন:

❝ মিথ্যা বলেছে জ্যোতির্বিদ ও জ্যামিতিবিদরা, তারা তো আল্লাহর গায়েবি ইলমের দাবিদার, তাদের উভয়ের একই উক্তি পৃথিবী গোলাকার। ❞

[নুনিয়্যাতুল কাহতানী, পৃষ্ঠা ২৯]

অতএব, যতটুকু বোঝা যায় সমতল নাকি গোলকার এই ইখতিলাফটা শুরু হয় দর্শনতত্ত্ব প্রবেশের পর থেকেই। সুতরাং সালাফদের মধ্যে গোলাকার মতের ওপর ইজমা হয়েছিল এর কোনো প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন: অনেক আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ তো গোলাকার পৃথিবীর ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাহলে তাঁরা কি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী ফতোয়া দিয়েছিলেন? তাঁরা কি আপনাদের থেকে কম বুঝতেন?

জবাব: আজ একদল লোকেদের দেখবেন যারা এরকম প্রশ্ন করে যে, ইবনে হাজম রঃ, "ইবনে তাইমিয়া রঃ, বিন বায রঃ সহ আরো অনেকেই... এনারা তো পৃথিবীকে গোলাকার বলেছিলেন, তারা কি কুফরি আকিদা রাখতেন, তারা কি কুফরি শিক্ষা দিয়েছেন, তারা কি কম বুঝেছিলেন...?"

আমরা এরূপ প্রশ্নকারীদেরকে সোজাভাষায় ফিতনাবাজ ও মূর্খ বলি এবং এদেরকে এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি।

যেসকল আলিম কুরআন সুন্নাহ ছেড়ে নিজ মতামত ও কুরআনের শব্দের দূরবর্তী অর্থের যুক্তিমূলক ব্যবহারের গোলের সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা হয়ত পরিবর্তনশীল যুগের (তৎকালীন আধুনিক) ধ্যানধারণার সাথে সমন্বয় সাধন এবং তাল মেলানোর জন্য এরকমটা করেছেন, অথবা শুধুই অনিচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবচেতনভাবে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কেউ হয়ত দাওয়াতের স্বার্থে বা পরিস্থিতির চাপে এরকম করেছেন অথবা এ কস্মোলজিক্যাল প্যাগানিজম কিরূপ ভয়াবহ কুফরি আকিদার জন্মদানকারী সে ব্যপারে যথেষ্ট তথ্য পাননি যেমনটা আজ আমরা ইন্টারনেট এবং অপবৈজ্ঞানিক বইপত্রের কল্যানে পাচ্ছি। ওয়া আল্লাহু আ'লাম। ব্যক্তিগতভাবে, তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল গুলোকে এতটা গুরুতর পর্যায়ের দেখিনা তাঁদের সাগর পরিমাণ ইলম ও খিদমতের সামনে।

আমরা শুধু কুরআন হাদিস, সাহাবী ও তাফসির বিশারদগনের কথাগুলোকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরছি এবং ভবিষ্যতেও প্রকাশ করব, যার ভাল লাগবে সে সাহাবীদের বিশ্বাসকে গ্রহন করবে, যার ভাল লাগবে না সে সবকিছু জেনেবুঝেও কাফিরদের কল্পিত বিশ্বাস তথা দর্শনকে আরো ভালভাবে আঁকড়ে ধরবে। বস্তুত, (তাকদীর অনুযায়ী) যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেদিকেই ধাবিত হবে।

প্রশ্ন: পৃথিবী যদি সমতল হয় তাহলে পৃথিবীতে এতটা স্পেস এজেন্সি রয়েছে তারা কি সবাই মিথ্যাবাদী? আর তারা যে পৃথিবী ও মহাকাশের ছবি-ভিডিও দিচ্ছে সেগুলো কি?

জবাব: যেহেতু নাসায় প্রথম এই ফিল্ডে। তাই সমস্ত মহাকাশ সংস্থা নাসার পিছনে একই লোক দ্বারা পরিচালিত হয়। আর এই টেকনোলজির যুগে ছবি-ভিডিও করার বিষয়ে কথা বলাটা বোকামী।

এবার কিছু বাস্তবিক প্রমাণ দেওয়া হলো। যেগুলো প্রমাণ করে পৃথিবী সমতল ও স্থির। "বাস্তবতার দর্পনে সমতল পৃথিবী" এই নামে সিরিজ আসবে ইনশাআল্লাহ। এই সিরিজের কয়েকটা পর্ব পাবলিশড হয়ে গেছে। দেখুন:

১) কল্পিত বক্রতা:

https://wasimsaikh03.blogspot.com/2024/07/curvature.html

২) জাহাজগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় কেনো:

https://youtu.be/B4t-5JQU_eg?feature=shared

৩) যদি পৃথিবী সমতল হয় তবে কেনো সব জায়গা থেকে সূর্যকে দেখা যায়না কিংবা কেনো একসাথে দিনরাত হয়না:

https://wasimsaikh03.blogspot.com/2024/07/blog-post.html

৪) সমতল পৃথিবীর ওপর সূর্যের চলাচল:

https://youtu.be/a3Pv-6PAtc8?feature=shared

৫) পাইলটরা পৃথিবীর সমতলতার ব্যপারে সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত জ্ঞান রাখে। অল্প কিছু পাইলট এর ব্যাপারে মুখ খুললেও অধিকাংশই চুপ থাকে। তাঁদের মধ্যেই কিছু পাইলটদের নিজ মুখ থেকে শুনুন পৃথিবী সমতল:

https://youtu.be/yXRP2KlST6c?feature=shared

৬) ককপিট থেকে সমতল পৃথিবীকে কেমন দেখায়:

https://youtu.be/NNr-Y1AOrqc?feature=shared

৭) high altitude ballon ফুটেজ দেখাচ্ছে পৃথিবী সমতল:

https://youtu.be/zEcOMypVL_k?feature=shared

৮) উড়োজাহাজের গতিপথ প্রমাণ করে পৃথিবী সমতল:

https://youtu.be/6zEh0qALcGE?feature=shared

৯) কোনো বক্রতা নেই, এটা সমতল:

https://youtu.be/WlM_1Qz1e5o?feature=shared

১০) কল্পিত স্যাটেলাইট:

https://youtu.be/t5cCUuj8UGY?feature=shared

১১) মাউন্ট এভারেস্ট থেকে ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ:

https://youtu.be/KTQbEZiR_c4?feature=shared

১২) সূর্যের দূরে চলে যাওয়ায় সূর্যাস্ত:

https://youtu.be/yovS1HUQypw?feature=shared

১৩) থিওরি বনাম বাস্তবতা:

https://youtu.be/i15RMKZxOtM?feature=shared

১৪) সূর্য আসলে যেমন:

https://youtu.be/Sdo5uqSQem4?feature=shared

১৫) দ্রুতগামী জেটপ্লেনগুলো পৃথিবীর কল্পিত বক্রতা মেনে চলে না, এটা প্রমাণ করে পৃথিবী সমতল:

https://youtu.be/AdZ-KIrXRE0?feature=shared

১৬) সূর্য কি কল্পিত মহাকাশে নাকি পৃথিবীর ওপরে:

https://youtu.be/Cja4DQg1lhQ?feature=shared

১৭) কুফফারদের ডকুমেন্টরিতে সমতল পৃথিবীর বর্ণনা:

https://wasimsaikh03.blogspot.com/2024/07/nasa-cia.html

১৮) নাসা আমাদের যেসব পৃথিবীর ছবি দেখায় সেগুলো কতটা সত্য?

জবাব: মিথ্যা। CGI নির্মিত ওদের ছবিগুলোর সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। মজার কথা হচ্ছে যে, ওদের দেওয়া ছবিগুলো প্রায়ই কয়েক বছর পরপর চেঞ্জ হতে দেখা গেছে। দেখুন...

2002:

https://solarsystem.nasa.gov/resources/786/blue-marble-2002/

2012:
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2159.html

2015:

https://nasaviz.gsfc.nasa.gov/30763

১৩. মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে মানুষ স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও কুদরাত সম্পর্কে জানতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। যাদের মাঝে চিন্তা-ভাবনার গুণ নেই, তারা আল্লাহর দেওয়া আলো-বাতাস এবং অসংখ্য নেয়ামতে ডুবে থেকেও তাঁর বড়ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। সৃষ্টিজগতের অনাচে-কানাচে আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টি নিদর্শন দেখেও তারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের অজান্তেই শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন:

❝আর আসমান ও যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সবকিছু দেখে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন। তাদের বেশীর ভাগই আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, তবে তার সাথে (ইবাদতে) শির্ক করা অবস্থায়।❞ [১২:১০৫-১০৬]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের শাস্তির দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টিরাজি অবলোকন করত। কিন্তু এগুলো নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করত না' ।

[তাফসীরে কুরতুবী ৯/২৭২]

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ অধিকাংশ মানুষের উদাসীনতার ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন, যারা আল্লাহর তাওহীদের অকাট্য প্রমাণবাহী নিদর্শন সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না।... এসবই মহান আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টির অনন্য নির্দশন। এতে রয়েছে চিন্তাশীল বান্দাদের জন্য উপদেশ। এতে রয়েছে আল্লাহর একত্ব, বড়ত্ব, অমুখাপেক্ষিতা এবং সীমাহীনতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৪১৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার একত্ব, ক্ষমতা প্রকাশের পূর্বে একাধিক আয়াতে আসমান-যমীন, চাঁদ-সূর্য ও তারকার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো সবই আল্লাহর নিদর্শন। জ্ঞানীরাই এসকল নিদর্শন বা সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। আল্লাহর প্রতিটা সৃষ্টি এরূপ নিদর্শনস্বরূপ

যা মানুষকে আল্লাহর কথা এবং তার সাথে পুনরুত্থান দিবসে সাক্ষাতের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং সে ব্যাপারে বিশ্বাসকে দৃঢ় করে।

মহান আল্লাহ বলেন:

❝আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন খুঁটি ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।❞ [১৩:২]

তবে হ্যাঁ, বর্তমানে কল্পবিজ্ঞানীরা মহান আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে যে চরম বিকৃত ধারনা দেয়, যেগুলোর অস্তিত্ব শুধু বইয়ের পাতায়ই, বাস্তবতার দর্পনে যেগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই। নিঃসন্দেহে সেই বিকৃত অপবিদ্যাভিত্তিক চিন্তাগবেষণা একদমই নিরর্থক।

কত সময় অযথা নষ্ট হয়, অথচ বান্দা একটু সময় নিয়ে আল্লাহর এ সুনিপুণ আকাশ নিয়ে ভাবে না । তাই তো মহান আল্লাহ বলেন:

❝আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।❞ [২১:৩২]

তাফসীরে ইবনে কাসীর (৭৭৪হি):

অর্থাৎ তারা মোটেই চিন্তা গবেষণা করে না যে, কত প্রশস্ত, সুউচ্চ ও বিরাট এই আকাশ তাদের মাথার উপর বিনা স্তম্ভে আল্লাহ তাআলা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতঃপর ওকে সুন্দর সুন্দর তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। ওগুলির কিছু কিছু স্থির আছে এবং কিছু কিছু চলমান রয়েছে।

অথচ আমরা এই আকাশের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে বসেছি। কেউ তো আবার যুক্তি খাটিয়ে এও বলে যে আকাশ এতো.. দূরে যে আমরা দেখতেই পাইনা,,আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। আস্তাগফিরুল্লাহ...

যাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা সেই হৃদয় দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না এবং উপদেশ হাছিল করে না, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

মহান আল্লাহ বলেন:

❝আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল।❞ [৭:১৭৯]

ইমাম আবূ জা 'ফর তাবারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্য থেকে তাদেরকেই জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাদের হৃদয় আছে; কিন্তু সেই হৃদয় দিয়ে আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তাঁর একত্বের প্রমাণবাহী দৃষ্টান্তসমূহ নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখে না এবং তাঁর নবী-রাসূলদের দলীল-প্রমাণ থেকেও উপদেশ হাছিল করে না। যদি তারা গভীরভাবে চিন্তা করত, তাহ' লে তাদের রবের তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করত এবং তাদের নবীদের নবুঅতের সত্যতা সম্পর্কেও অবগত হ' তে পারত। *[তাফসীরে তাবারি ১৩/২৭৮]*

অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করত, তাহ'লে তারা আল্লাহর প্রতি খালেসভাবে ঈমান আনত এবং তাঁর নবী-রাসূলদের অনুগত্য করত।

সেজন্য মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের চিন্তার ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা তাঁর সৃষ্টির নিপুণত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদেরকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। রহমানের বান্দারা দাঁড়ানো, বৈঠকে ও শায়িত সর্বাবস্থায় সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন:

❝নিশ্চয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।/ যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে 'হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।❞ [৩:১৯১]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) 'উলুল আলবাব' বা জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, সেটা হচ্ছে আল্লাহর কুদরত, তাঁর সৃষ্টিরাজি এবং ছড়িয়ে থাকা দৃষ্টান্ত সমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, যেন তাদের দূরদর্শিতা আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা সবকিছুতেই আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তিনি এক ও একক' । *[তাফসীরে কুরতুবী, ৪/৩১৩]*

সেজন্য আকাশ-যমীন সহ আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিরাজি নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। যেমন মহান সুরা গাশিয়ার মধ্যে বলেন:

১৭) তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে?

১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে?

২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?

তাই বান্দার কর্তব্য হল- রহস্যময় সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা এবং সেই মহান সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। মহান আল্লাহ যখন প্রত্যেক রাতের শেষ প্রহরে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বান্দাকে ডাকতে থাকেন, তখন যেন আমরা যমীন থেকে সেই আকাশের মালিকের ডাকে সাড়া দিতে পারি। আমাদের এই পার্থিব জীবন যেন কেবল তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যে নিঃশেষিত হয়। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

সমাপ্ত